মুদ্রা-দোষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মূল্য একটাকা।

প্রকাশক

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

প্রিণ্টার

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য

মানসী প্রেস

১৪এ রামতনু বসুর লেন

কলিকাতা।

আবাল্য বন্ধু

শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ বসু

যতী,

'পূর্ণিমা-সম্মিলন' 'সঙ্গত' প্রভৃতি বন্ধুগণের বৈঠকে যে নিবন্ধ সময়ে সময়ে পড়েছি, তাই এই পুস্তকে গ্রথিত হলো। দু-দণ্ডের আনন্দ দেবার জন্য যা লেখা যায়, তা প্রকাশের যোগ্য কিনা সে সন্দেহ আমার মনে আছে। অস্থায়ীকে কেহ স্থায়ী করতে পারে না। সে ইচ্ছাও নেই। এর কোথাও যদি একটু আনন্দ পাও, তবে আমাদের সেই অতীত দিন স্মরণ করিও। ইতি—

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩২৯

তোমারই
খগেন

সূচী

মুদ্রাদোষ

কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইলে যে, প্রথমে বস্তুনির্দ্দেশ করিতে হয় সে কথাটি আগে আমার মনে হয় নাই। যখন মনে হইল তখনই বুঝিলাম যে সে পক্ষে যথেষ্ট গোলযোগ আছে। মনে করিলাম সঙ্গতের বৈঠকে যৌথ কারবারে অর্থাৎ সকলে মিলিয়া ভাগেযোগে ইহার নিষ্পত্তি করা কঠিন হইবে না।

মুদ্রাদোষ জিনিষটা কি? এই প্রশ্ন মনে উঠিতেই প্রথমে কানিংহাম সাহেব প্রভৃতি মুদ্রাতাত্ত্বিকদিগের কথা মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু আমাদের বন্ধু হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে—তাঁহারা 'অতীত যুগের মানব'। এ কালের সুধীবর রাখালদাসের শরণ লইব, এমন একটা কল্পনাও মনে আসিয়াছিল। আমি কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছি তাঁহার প্রতি আমার আস্থা নাই। তিনি একজন বিজ্ঞ মুদ্রাতাত্ত্বিক হইলেও কিছু দিন পূর্ব্বে, যে পাষাণে কর্দ্দম পর্য্যন্ত নাই, সেই পাষাণের দুর্ভেদ্য স্তরে নামিয়া গণ্ডকী শৈলে মূষিক-

রূপী নারায়ণের ন্যায় রস অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন * এবং সম্প্রতি আবার মুদ্রাযন্ত্রে তাঁহার উপন্যাস মুদ্রাগমের সূচনা করিতেছে।

তার পর মনে হইল মিণ্টের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর কথা। কিন্তু তাঁহাকে মুদ্রা-দোষের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমি যদি একখানা খেয়াল গাই, তাবে তাহার 'সঙ্গৎ' করিয়া, এই সঙ্গতে বাহাদুরী লইতে হয়ত রায় বাহাদুর অধিকতর আগ্রহে অগ্রসর হইবেন।

প্রত্নতত্ত্ব এবং মুদ্রা বিভাগ ছাড়িয়া দিয়া তান্ত্রিকদিগের শরণাপন্ন হইতে একবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম: কিন্তু তাঁহাদের পঞ্চ 'ম'-কারের প্রথমটাতেই বেজায় আটকাইয়া যায়। তাহা না হইলে, তাঁহাদের আচরিত নানাবিধ দোষ-শূন্য মুদ্রার অনু-ষ্ঠানে পঞ্চ 'ম'কারে বিভোর হইয়া, ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার সঙ্গমস্থলে সহস্রদল পদ্মের অভ্যন্তরে এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সঙ্গোপনে প্রবুদ্ধ করা মোটেই শক্ত নয়।

তান্ত্রিকদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া একবার কর-

---

* 'পাষাণের কথা—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

কোষ্ঠী-বিজ্ঞানের অকৃত্রিম সেবকদিগের নিকট সন্ধান লইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিজ্ঞতার সহিত বলিয়া দিলেন যে,—

'একমুদ্রা ভবেদ্রাজা বহুমুদ্রা দরিদ্রতা।'

সেই হইতে স্বল্প মুদ্রার পক্ষপাতী হইয়াছি। আশা আছে যে, হাতে যখন মাত্র একটি মুদ্রায় দাঁড়াইবে, তখন রাজা হওয়ার আর বড় বিলম্ব থাকিবে না। কিন্তু ঠিক সে পর্য্যন্ত এখনও গিয়া উঠিতে পারি নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে প্রতিদিন অসংখ্য মুদ্রাদোষ আমাদের নেত্রপথে পতিত হইতেছে; কিন্তু সে ভূতগুলি মুদ্রাকরের স্কন্ধে চাপাইতে পারিলেই সব দিক বজায় থাকে। বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতেও কণ্ঠস্থ হয় নাই; এক্ষণে মুদ্রাকরের মতামতের জন্য 'সম্পাদক দায়ী নহেন' সুতরাং গ্রন্থকার বেমালুম সরিয়া পড়েন। সহৃদয় পাঠক অশুদ্ধি-সংশোধন-পত্রাভাবেও নিজ গুণে সব ঠিক করিয়া লইবার ভার লইবেন। একজন লিখিলেন "উন্মাদিনী কেশরী" দোহাই দিলেন মুদ্রাদোষের। সুতরাং সাহিত্যিকগণের আসরে এরূপ মুদ্রাদোষের বিচারে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত হইবে না।

যাহা হউক বস্তুনির্দ্দেশেই যখন এরূপ বিভ্রাট, তখন অবিঘ্ন-পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? তবে একটি কথা আছে— মাসিকপত্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্পের মত আমাদের এই মুদ্রাদোষ অ-ফুরন্ত। চন্দ্রমার আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাদোষের যে সকল মাসিক সংস্করণ বাহির হইবে, তাহাতে কোনও না কোনও সময়ে এই নষ্ট পাদ পূরণ করিয়া লইতে পারিব, এমন আশা এই নবাবিষ্কৃত সঙ্গতের পক্ষে অসঙ্গত নয়।

সূচনার পক্ষে আমার বোধ হয় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তাহাকে পদার্থ কহে; এবং সেই পদার্থের মধ্যে মুদ্রাদোষ একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত পদার্থ। মুদ্রাদোষের মধ্যে কতক-গুলি চেতন, কতকগুলি অচেতন। কতকগুলি আবার উদ্ভিদ্ কিনা, সে সম্বন্ধে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব। * ভগবানের কৃপায় ঘরের ছেলে শীঘ্র ঘরে ফিরিলে হয়। বর্ব্বরদিগের নিকট উদ্ভিদের সাড়া দেখাইতে গিয়া সঙ্গীনের খোঁচায় নিজেকে সাড়া দিতে না হয়, তাহা

* আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন বিলাতে ছিলেন।

হইলে আপাততঃ আমরা বাঁচি এবং মুদ্রাদোষের এই শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধেও একটা কূলকিনারা হয়।

বিশেষ সংজ্ঞা দিতে না পারিলেও একটি সান্ত্বনার বিষয় এই যে, মুদ্রাদোষ আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। তবে অনেক সময় সেগুলি দেখিতে পাই না, অপরে কিন্তু দেখিতে পায় এবং যথেষ্ট উপভোগও করে। কতকগুলি মুদ্রাদোষ আপনারা চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন, কতকগুলি অনুমানের দ্বারা লাভ করিবেন; এবং কতকগুলি সম্বন্ধে আমার "আপ্ত-বচন" কি যথেষ্ট হইবে না? মুদ্রাদোষ আমাদের মধ্যে ত্রিমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকে: কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। কায়িক মুদ্রাদোষের সহিত আপনারা বেশ পরিচিত আছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশী বাক্যব্যয় করা আবশ্যক হইবে না। একজন নিপুণ "বাজিয়ে" বা ওস্তাদ কালোয়াতের দিকে একটু লক্ষ্য করিলে কায়িক মুদ্রাদোষের প্রকৃত উদাহরণ পাইবেন। ধ্রুপদ বা তেওরায় তেহাইয়ের সঙ্গে মাথা ঘুরাইয়া কছরৎ করিবার সম্বন্ধ কি, এবং একখানা সহজ ভীমপলশ্রী বা কেদারা আলাপ করিতে গিয়া অর্দ্ধঘণ্টা-ব্যাপী নানা প্রকার মুখ ব্যাদান সহকৃত "তুম্ তা না না না" করিবার অধিকার কি, এ বিষয়ের গবেষণায় আমি বহু কাল

যাবৎ নিযুক্ত আছি। সঙ্গীতের ঐ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, আমার সঙ্গীত চর্চ্চায় কিছু বাধা পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গীত চর্চ্চায় যাঁহারা আমার সহযোগী ছিলেন, বা আমার পরেও যাঁহারা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও, গীত এবং বাদ্য ততটা অভ্যাস না করিয়া থাকিলেও, উহার আনুসঙ্গিক মুদ্রাদোষগুলি বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনারা নিশ্চয়ই এমন দুই একজন অশ্বারোহী দেখিয়াছেন যে, যাহারা অশ্বপৃষ্ঠে চড়িবামাত্র শরীরকে যথেষ্ট বেগে চালনা করিতে থাকে, অশ্বচালনা তাদৃশ হউক আর না হউক। তাহারা শরীরটাকে যতক্ষণে ঝাঁপে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ততক্ষণে অশ্ব হয়ত ধীর "কদমে" চলিতেও আরম্ভ করে নাই। শিক্ষানবিশ সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে অশ্বারোহী-শ্রেণীর মুদ্রাদোষ দেখা যায়।

আমাকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, যে-কোনও অঙ্গভঙ্গীর কালে মুদ্রাদোষে পরিণত হইতে পারে। বাম হস্তে গুম্ফ আকর্ষণ করা একটি নির্দ্দোষ ব্যাপার, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে একজন ঐ কার্য্যে এমন পরিপক্ক হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বামপার্শ্বের গুম্ফরাজি ক্রমে অদৃশ্য হইয়াছিল।

রহস্যের স্থলে হাসি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু কেহ কেহ এমন অভ্যাস করিয়াছেন দেখিয়াছি যে, কোনও পরিহাসে সকলে যখন হাসিয়া আকুল, তখন তিনি গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করেন। এবং সকলের হাসি নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইলে মুহূর্ত্তের জন্ম জনান্তিকে একটু হাসিয়া লন। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পুঁথি বাড়িয়া যায়।

কায়িক মুদ্রাদোষ জাতিগতও হইতে পারে। আপনারা দেখিবেন কোনও কোনও জাতীয় লোক কথা কহিবার সময় দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে। মস্তক কণ্ডূয়ন করিবার সময়ে দ্রুত হস্ত সঞ্চালিত হয় এবং সিগারেট খাইবার সময় পা দুটি ফাঁক না করিলে যেন চলে না—এসব মুদ্রাদোষ ভাবান্তর মাত্র। মানবের এই সকল মুদ্রাদোষ দেখিলে তাহাদের অরণ্যচারী পূর্ব্বপুরুষের কথা মনে পড়ে। কপিপ্রবরদিগের মুদ্রাদোষ সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, আশা করি। ইহাদের নিকট যদি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু দোষ-ঘটিত অর্থাৎ বে আইনী মুদ্রা পাইয়া থাকি তবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই সকল বনচরদিগের সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কিছু বলিবার উদ্দেশ্য নাই। আপনারা গবেষণা মূলক অনুসন্ধান

করিতে ইচ্ছা করিলে বনপর্ব্ব, অরণ্যকাণ্ড কিংবা প্রচীনতর বৃহদারণ্যক একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে পারেন ।

দুই একটি মুদ্রাদোষ থাকা সব সময়ে মন্দ নহে; পরন্তু গভীর চিন্তাশীলতার লক্ষণ । তুমি কবি দার্শনিক বা প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে চাহ, সব বিষয়ে নিখুঁত পারিপাট্যের দিকে নজর রাখিও না । একটু নেলা ভোলা, মুক্তকচ্ছ, হিসাবশূন্য হইতে পারিলে ভাল হয় । নিতান্ত না পার, দুই একটি মুদ্রাদোষ যত্নে অর্জ্জন করিও! একটু কুঁজো হইয়া চলিতে পার ভাল; কারণে অকারণে হাসিবার অভ্যাস করিতে করিতে পার; শূন্যে অর্থশূন্য দৃষ্টি ঘন ঘন চালনা করিতে পার, নাসিকা উর্দ্ধে তুলিয়া ভ্রূ দুইটি যতখানি সম্ভব নামাইয়া অক্ষিতারকা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিতে পার । অন্ততঃ ঘড়ির চেইনটি পুনঃ পুনঃ হস্তে পাকাইতেও ত পার । তাহাও যদি সুবিধা না হয়, নস্য গ্রহণ কর । বলা বাহুল্য, এ সকল মুদ্রাদোষ চেতন, অচেতন নহে । প্রয়োজনের বাহিরে কিংবা গৃহে ফিরিয়া, আফিসের পোষাকের মত, এ গুলিকে তুলিয়া রাখা যাইতে পারে ।

বাচনিক মুদ্রাদোষের উদাহরণ অনেক পাওয়া যায় । এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে গেলে নিজের কোনও মুদ্রাদোষ

হয়ত বাহির হইয়া পড়িবে। "ওর নাম কি" পণ্ডিত মহাশয়দিগের কৃপায় প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অনেকে কথায় কথায় "ইয়ে", "তোমার", "তোমার গে", "বুঝেছেন", "জানেন", "Well", "Look here", "Dont you see", "The thing is" অজস্র ব্যবহার করিয়া যান। "আপনার সঙ্গে সেই ইয়ে হওয়া অবধি আমি আর ইয়ে করতে পারছি নে।" "এই 'তোমার' বাড়ী থেকে এসে অবধি 'বুঝলেন,' খরচপত্র অভাবে 'তোমার গে' কোনও কাজে সুবিধা করতে পারি নি 'জানলেন" ইত্যাদি। আজকাল ইংরেজি শিক্ষিত দিগের মধ্যে কথায় কথায় "মানে" কথাটা ভালমান ব্যতীত প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু সে "মানে" যে কিসের "মানে" তাহার এ পর্য্যন্ত ঠিকানা করিতে পারি নাই। "আপনার বোধ হয় আজ কাল কোনও অভাব নাই, মানে আপনার প্রকৃতি আমি যতদূর জানি।" এক এক জনের এই রকম মুদ্রাদোষ যে কতখানি গড়ায় তাহা আমার একটি বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম। তাঁহার এক আত্মীয় একটি গোটা সার্দ্ধ গজ প্রমাণ দীর্ঘ বাক্য কথায় কথায় ব্যবহার করিতেন—"এই তোমারে পষ্ট বসি আমার পানে ফিরে চাও"। যুদ্ধের সঠিক খবর 'এই তোমারে পষ্ট বলি আমার পানে ফিরে

চাও' মোটেই বের করতে দিচ্ছে না। লোকে যে ভিতরকার অবস্থাটা জানতে পারে, 'এই তোমারে পষ্ট বলি আমার পানে ফিরে চাও' এটা একেবারেই ওদের ইচ্ছে নয়।"

যাক্, এইবারে মানসিক মুদ্রাদোষের কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে অব্যাহতি দিব। কতকগুলি লোক আছে যাহাদের ভিতরকার প্রকৃতিটা সব সময়ে এই রকম এক একটি মুদ্রাদোষে হোঁচোট খাইতেছে। আঁবের মধ্যে পোকা থাকিলেও বাহিরে সেটা যেমন ধরা পড়ে না, ভিতর-কার এই মুদ্রাদোষগুলিও সব সময়ে আমাদের চোখে পড়ে না। একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে হয়। কেহ মনে করে আমি জজের পেস্কার, কাহারও অভিমান সে বিশেষজ্ঞ, কোনও কবি ভাবেন আমিই শ্রেষ্ঠ, লোকে যে সমাদর করে না, সে কেবল তাহারা অজ্ঞ, বাতুল বলিয়া; কেহ মনে করে, আমি পঠদ্দশায় একবার সবচেয়ে বড় কবি সেক্সপীয়রের সব চেয়ে বড় নাটকের সব চেয়ে কঠিন জুলিয়স সীজরের পার্ট প্লে করিয়াছিলাম, সে একদিন ছিল ইত্যাদি। অবশ্য এই রকম অভিমান মনে আসিলেই যে তাহাকে মুদ্রাদোষ বলিব তাহা নহে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে লোকে এগুলিকে এমন অভ্যস্ত করিয়া ফেলে যে, ঠিক অঙ্গভঙ্গীর মত এগুলি

মুদ্রাদোষে গিয়া দাঁড়ায়। সে সব লোককে একটু নিরীক্ষণ করিলেই ধরিতে পারা যায়। একজন লোক রাস্তা দিয়া চলিতেছে, আপনি বারান্দার উপর থেকে দেখিতেছেন যে, সে বারেবারে নিজের কাপড় চোপড়ের দিকে অতি কোমল এবং প্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রিতে করিতে যাইতেছে। এ ব্যক্তি নিশ্চয় মুদ্রাদোষী। সে ভাবিতেছে যে, রাস্তার যাবতীয় লোক কেবল তাহার বেশভূষা ও রূপ দেখিতেই ব্যস্ত। কিছুতেই সে এ কথাটি ভুলিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ এমন আছেন যে, তিনি সব সময়ে আপনাকে জগতের রঙ্গ-ভূমিতে অগণিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিত মনে করেন, তিনি ভাবেন যে সমস্ত লোক কেবল তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এ প্রকার লোক মানসিক মুদ্রাদোষের কবলে পতিত। বন্ধু বান্ধবের অনেক আমোদ ইহাঁরা অজ্ঞাতসারে যোগাইয়া থাকেন। ইঁহাদের জয় হউক।

প্রত্যেকের প্রকৃতিতে একটু না একটু বৈশিষ্ট্য আছে, আমি সেগুলিকে মুদ্রাদোষ বলি না। যেমন কাহারও কাহারও দিনের বেলা না ঘুমাইলে ক্ষুধা হয় না, খাবার পরে একটা সন্দেশ না খাইলে হজম হয় না, মন্টিনেগ্রিন লড়াই পাইলে কিছুতেই না বুঝিয়া ছাড়ে না। অনেকের পক্ষে আফিস

বন্ধ হইলে ফাঁকায় না গেলে প্রাণটা নেহাৎ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। ইত্যাদি।

আপাততঃ এইখানে আমার বক্তব্যের শেষ করি। আর শ্রোতাদিগের যে মুদ্রাদোষ—অর্থাৎ করতালি দেওয়া—তাহার উদাহরণ আপনারা সরবরাহ করুন।

প্রশংসা-প্রসঙ্গ

অনুপ্রাস মাফ করিবেন। বস্তুতঃ অনুপ্রাসের খাতিরে আমি প্রশংসার পশ্চাতে "প্রসঙ্গ" প্রয়োগ করি নাই। "প্রসঙ্গ" কথাটির বহুল প্রচলনই আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। আমার একজন বন্ধু এক অতি অপূর্ব্ব নূতন জিনিষ "পুরাতন প্রসঙ্গ" নাম দিয়া বাহির করিয়াছেন। * কিন্তু এমন একটা প্রকাণ্ড প্রতারণা আপনারা ধরিতে পারিলেন না, ইহাই আমার সে গুপ্ত বন্ধুর বাহাদুরি। আমার এই প্রশংসা প্রসঙ্গে কোনও লুকোচুরী থাকিবে না, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই নিঃসংশয়ে বলিয়া রাখিতেছি।

"প্রশংসা"র স্বরূপ নির্ণয়ে আমি আপনাদিগের সময় অপহরণ করিতে চাহি না। প্রশংসার প্রভাবে ব্যুৎপত্তির অনেক সময় লোপ হয়, সুতরাং ইহার ব্যুৎপত্তি আর কি বলিব? তবে, "প্রশংসা"য় উপসর্গের বড় বাড়াবাড়ি। মূল ধাতু 'শংস' সম্বন্ধে আপনাদের যে কোনও সংশয় থাকিতে

---

* 'পুরাতন-প্রসঙ্গ'— শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম-এ।

পারে, সেরূপ আমার মনে হয় না। ধাতু প্রত্যয় ধরিতে গেলে ইহার বেশী কিছু নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন। তবে আমাদের 'ধাতু' আবার এমনই 'অদ্ভুত' যে, সহজে 'প্রত্যয়' হওয়া দুর্ঘট। তোমাকে যখন কেহ প্রশংসা করিল, তখন ইহা প্রত্যয় করিতে তোমার মোটেই প্রবৃত্তি হয় না যে তাহার পশ্চাতে একখানি লঘু মেঘখণ্ডের মত বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; অপর কোনও দিক হইতে একটু বাতাসের সাহায্য পাইলেই তাহা নিন্দার ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে। দুর্ব্বাক্যের তীব্র জ্বালাময়ী অশনিও তাহাতে চকিতে চমকিয়া উঠিতে পারে।

আমার এক বন্ধু গ্রন্থকার। একদিন তিনি তাঁহার গ্রন্থখানি দেখিবার জন্য আমাকে তাঁহার ভবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে এরূপ আহ্বান পাইয়া আমি যে সুখী হইলাম, সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি আমাকে পাইয়া তাঁহার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার আয়োজন করিয়া বসিলেন। আমার ত চক্ষুঃস্থির। তবে সাহিত্যিক বন্ধুগণের সাহচর্য্য লাভে যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা স্বভাবতঃই কিছু সহিষ্ণু; মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে এরূপ স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কেহ একটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা আপনাকে না

শুনাইলে তাঁহার কবিতা সার্থক হয় না ; কেহ একটি ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা ব্যাপী ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাঁহার খানিকটা অন্ততঃ (অর্থাৎ আগাগোড়া) আপনাকে শুনিতেই হইবে ; কেহ একটি সমালোচনা লিখিয়াছেন, তাহা আপনার ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি একবার না শুনিলে, তাহা ছাপিতে দিতে লেখকের কেমন কেমন বোধ হয় ! (অথচ সে সমালোচনা যে বহুপূর্ব্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন)। আপনাকে এ সকল শুনিতেই হইবে এবং শ্রবণকালে আপনি আপনার পারলৌকিক চিন্তায় লিপ্ত থাকুন, আর ভাল করিয়া ভাব গ্রহণ ব্যপদেশে একটু তন্দ্রালু হইয়াই পড়ুন তাহাতে তত আসিয়া যায় না। পাঠ শেষে আপনি যদি বলেন! "বাঃ এরই মধ্যে শেষ হল! কি চমৎকার! কবিতাটি রবীন্দ্রবাবুরও যোগ্য, গল্পটি প্রভাত বাবুকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, সমালোচনাটি সমালোচ্য পুস্তক অপেক্ষাও প্রতিভার পরিচায়ক—।" ইত্যাদি বা এইরূপ ধরণের কিছু—তাহা হইলেই আপনার বন্ধু খুব খুসী হইবেন। ইহার পরে যদি আপনার ভাগ্যে মাঝে মাঝে জলযোগের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে আপনি বিস্মিত হইবেন

না। তবে দুঃখ এই যে, এ দেশে সাহিত্যিকগণ বড় গরীব। দুই একজন ভাগ্যবান লেখক যাঁহারা ধনী, তাঁহারাও দুর্ভাগ্যের বিষয়, সস্তায় সারিতে চান।

আমার সেই বন্ধু, যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তিনি ধনী নহেন। তিনি যখন তাঁহার দেড়শত পৃষ্ঠার কেতাবখানি খুলিয়া বসিলেন, তখন গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঈষৎ হেলিয়াছে। ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইল। তখন আমরা উঠিয়া ছাতে গেলাম। পরে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পাঠে বাধা জন্মাইতে লাগিল, তখন পুনরায় আমরা দীপালোকিত কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে পাঠ সমাপ্ত হইলে, জলখাবার আসিল। সেগুলি উদরসাৎ করিতে করিতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, তৃপ্তিকর জলযোগের মত তাহাও সরস হইয়াছিল।

অদৃষ্টের পরিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইল না। আর একজন সাহিত্য-রসিক বন্ধুর হাত এড়াইতে না পারিয়া ঐ পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে হইল আমাকেই। বন্ধুবরও আমার সহিত যোগদান করিলেন। সমালোচনায় অনেক কথা বলিলাম। কিন্তু সেগুলি গ্রন্থকারের গৃহে যাহা

বলিয়াছিলাম, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরকম। কিছু বেশী তীব্র হইয়া গেল। অনেকেই তাহা উপভোগ করিলেন; করিলেন না কেবল লেখক! অবশ্য ইহার পরে সেই গ্রন্থকার বন্ধু বা তাঁহার পুস্তকের নাম জানিতে চাহিয়া আমাকে কেহ লজ্জা দিবেন না, ইহা আমার কৃতাঞ্জলিসহ অনুরোধ।

অনেকে হয়ত আমাকে কপটতার জন্য দোষী করিতেছেন। যেটুকু কপটতা শিষ্টাচারের জন্য অনুমোদিত, আমি তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ নিশ্চয়ই মনে করিতেছেন। তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তখন আমি নিতান্ত অপরিণত-বয়স্ক, জলযোগের মহিমায় মুগ্ধ এবং সেদিন গ্রীষ্মের কিছু প্রাখর্য্য ছিল।

প্রশংসা জিনিষটি বড় মুখরোচক। প্রশংসার বদহজম মাঝে মাঝে শুনা গিয়া থাকে, কিন্তু অরুচির কথা বড় একটা শুনা যায় না। বরং সত্য মিথ্যায়, কর্ম্মে অকর্ম্মে অরুচি হইলে প্রশংসার পুর দিয়া তাহাকে বেশ মুখরোচক করিয়া তুলা যায়। এমন কি বশীকরণের মন্ত্র পর্য্যন্ত প্রশংসার উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতে গ্রথিত। ঋগ্বেদের স্তব স্তুতির যুগ হইতে বল্লালসেনের রজত-শাসনের কৌলিন্যযুগ

পর্য্যন্ত সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্রে প্রশংসার একাধিপত্য সূচিত হইতেছে। যিনি বলেন খ্যাতির বিড়ম্বনা আমি চাহি না, তোষামোদকে আমি ঘৃণা করি, তিনি গভীর জলে নোঙর করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে করেন প্রশংসার ছোট ছোট লাল ডিঙ্গিগুলি পাল তুলিয়া তাঁহারই দিকে ছুটিবে। তিনি মুখ ফিরাইয়া অপর দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাঁহার অপাঙ্গের লোলদৃষ্টি একবার চকিতে পশ্চাদ্দিকের সন্ধান জানিয়া লইতেছে। এত লোকের মধ্যে কেবল তাঁহারই যে প্রশংসা ভাল লাগে না—অন্ততঃ এই প্রশংসা-টুকুর কাঙ্গাল তিনি!

তবে একটি কথা বলিয়া রাখি—প্রশংসাটা ভরাপেটেই লাগে ভাল। সেই জন্য বাস্তবিকই আমার ভয় হইতেছে যে, এই জল-বিয়োগ-বিধুর অর্থাৎ নির্জ্জলযোগ সুতরাং অসঙ্গত সাহিত্য-সঙ্গতে আমার এই প্রশংসা আপনাদের তৃপ্তিকর হইবে কিনা। চায়ের ছলকে, চুরুটের ধূমে, তাম্বুলের রাগে প্রশংসার নেশা পাছে ছুটিয়া যায়, এই ভয় মনে বাসি।

প্রশংসার নেশা খুব জমে। প্রথমটা সব নেশার মত এ নেশাও ধরাইতে কিছু কষ্ট। অন্য নেশার শত্রু—

অর্থাভাব। এ নেশার শত্রু—বিদ্রূপ। প্রথমটা মাত্রা ঠিক না রাখিয়া প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন ঠাট্টা। তখন নেশা ধরিতে চাহে না। একবার প্রত্যয় হইয়া গেলে, শেষে প্রশংসার ফোয়ারা ছুটাইয়া দাও, নেশায় ভরপুর হইয়া যাইবে।

শেষে কা কা রবে চঞ্চু নড়ে
মিঠাই মাটীতে পড়ে
শৃগাল পলায় লয়ে মনের হরষে।

নিন্দার একটা গুণ এই যে, ইহাতে প্রায়ই আন্তরিকতা থাকে; প্রশংসায় প্রায়ই থাকে না। তাহা বলিয়া একেবারে আন্তরিকতাশূন্য নির্লজ্জ প্রশংসা সব যায়গায় চলে না। অনেক স্থলে পাতায় ঢাকা ফুলের মত, ঘোমটায় ঢাকা মুখের মত প্রশংসার মধ্যে একটু সঙ্কোচের ভাব থাকে। এই সংকোচের ভাব ঢুকাইয়া দেওয়াই প্রশংসার আর্ট (Art)। প্রশংসা দিতেও সঙ্কোচ, নিতেও সঙ্কোচ। বেণারসী সিল্কে শলমাচুমকীর কাজের মত এই সঙ্কোচ-টুকু বেশ জমাইয়া, মানাইয়া, মিশাইয়া দিতে অনেক কারিগরী চাই। সময়ে সময়ে একটি কথা, একটি ইঙ্গিত একটুখানি যতি, সুরের একটু কম্পনে এত প্রশংসা

প্রকাশ করা যায় যে, প্রশংসার দীর্ঘচ্ছন্দে একখানি বিরাট পর্ব্ব রচনা করিলেও তেমন লাগসই হয় না। এই মনে করুন, আপনি একটি কবিতা পাঠ করিতেছেন, আর আমি নির্ণিমেষে আপনার মুখের দিকে চাহিয়া এমনই গদগদ ভাব প্রকাশ করিলাম যে, সহস্র বাক্যযোজনার অপেক্ষা আপনি তাহাতেই গলিয়া গেলেন।

প্রশংসা অতি সস্তা হইলেও দুর্ম্মূল্য। অর্থনীতির হিসাবে কথাটা ঠিক না হইলেও, অনেক সময়ে এমন অনর্থও ঘটে। নদী, খাল, বিল সব সাগরে গিয়া মিশে। সাগরের জলের লোণা তাহাতে কাটে না। অভিমানের রৌদ্রকরে সে সব জল টানিয়া শুষিয়া ধোঁয়ার মত কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়। আর স্বচ্ছ নির্ম্মল পূতোদক সীতাকুণ্ডের সঙ্গে একটি ধারাও আসিয়া সঙ্গত হয় না। এমন অনেক স্থলে দেখা যায়।

প্রশংসা পাইতে যদিও সকলেরই খুব আগ্রহ আছে, কিন্তু দিতে তেমন আগ্রহ বড় দেখা যায় না। অনেকের প্রশংসাই দেখিবেন—সযত্নে ওজন করা বিন্দু বিন্দু কৃপা। সাময়িকপত্র-সম্পাদক এমনই এক তুলাদণ্ড হস্তে তাঁহার জীর্ণ মসীলিপ্ত টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছেন। গল্প,

প্রবন্ধ, কবিতা—ত্রিপদী, চতুষ্পদী, চতুর্দ্দশপদী—ভারে ভারে আসিতেছে। তিনি নিদ্রালু চোখে সেগুলি একবার তাঁহার তুলাদণ্ডে আছাড়িয়া ফেলিতেছেন, অধিকাংশই ঝরিয়া টেবিলের নীচে ঝুড়িতে পড়িয়া পচিতেছে; অবশিষ্ট ছাপাখানার মসী কর্দ্দম অতিক্রম করিয়া দিনের আলোক দেখিয়া জন্ম সার্থক করিতেছে। ইহাই প্রশংসার সম্পাদকীয় রীতি। আজ যাঁহাকে তাঁহার পত্রে স্থান দিয়া সম্পাদক সুমেরুশৃঙ্গে তুলিয়া দিলেন, কাল আবার সমালোচক হিসাবে তাঁহাকে বৈতরণীতে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহার কোনওটির জন্য "সম্পাদক দায়ী নহেন।" সম্পাদকীয় প্রশংসার নমুনা দিতেছি।

"মরীচিকা" একখানি কাব্য। আধুনিক কবিতা যেরূপ দুর্ব্বোধ অথচ লঘু, অর্থশূন্য অথচ মিষ্ট, সুন্দর বাঁধাই অথচ সুলভ, এখানিও সেরূপ। প্রীতি, অবসর, নির্ঝর, শেফালি প্রভৃতি কবিতা বাজে রাবিশ। অপর কবিতাগুলিতে মৌলিকতার লেশ নাই। কবিতার মধ্যে যেটুকু আর্ট, লেখক তাহা ধরিতে পারেন নাই, তবে মোটের উপর গ্রন্থখানি মন্দ নয়, আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।"

বলাবাহুল্য, সম্পাদক দায়ী নহেন।

অধিকাংশ লোকই প্রশংসার সম্পাদকীয় রীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। কেমন যেন একটু কৃপণতা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। আমাকে কেহ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে না, সে জন্যই হউক, অথবা আমি নিজের অভিমান লইয়া ব্যস্ত বলিয়াই হউক, অপরকে মন খুলিয়া সুখ্যাতি করিতে যেন কুণ্ঠিত। সকলেই যে এইরূপ ভাবাপন্ন, তাহা বলিতেছি না। কেহ কেহ এমন আছেন যাঁহারা নিঃসংকোচে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া প্রশংসা করিতে পারিলেই সুখী হন। যেখানে বার আনা প্রাপ্য, সেখানে ষোল আনা দিয়াও তৃপ্ত হন না।

প্রশংসার আর একটা বিপদ এই যে, কেহ কেহ অপরকে প্রশংসা করিবার উপলক্ষে নিজের প্রাপ্য আদায় করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করেন। আপনারা হয়ত দেখিয়াছেন যে অনেক প্রশংসাপত্রের ভাষা যেন জ্বলজ্বল করিতেছে, তাহার মধ্যে কত ভাব, কত কাব্য, কত রস প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছে! আমাদের মধ্যে দেখিয়াছি অনেকে প্রশংসাপত্র লিখিবার সময়ে, পাত্রের গুণাগুণ অপেক্ষা English Compositionএর দিকে

বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন। যেখানে আর একটি adjective না বসাইলে finish ভাল হয় না, একটা superlative না দিলে style জমাট হয় না, সেখানে চোখকাণ বুজিয়া দিয়া ফেলা যাক্—কে আবার ভাবে?

প্রশংসা-পত্রের ভাষায় আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে। কোনও কোনও প্রশংসাপত্রে প্রকৃত অর্থ গোপন করিবার বেশ একটী প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বাধ্য হইয়া যেখানে কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রশংসা করিতে হয়, সেখানে অর্থের একটু আধটু গোলযোগ থাকা মন্দ নহে। একজন ম্যালেরিয়া মিকৃশ্চার অথবা বকুল-কুসুম তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন; তাঁহাকে একটা ভাল সার্টিফিকেট দিতে হইবে। কি করা যায়? "নিয়মিত ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া রোগে অথবা কেশাল্পতায় উপকার দর্শিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি প্রকারে প্রশংসা করা চলে। কোনও কোনও প্রশংসা পত্রে দ্ব্যর্থবোধক বাক্যও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। একটি কেশ-তৈলের প্রশংসায় একজন লিখিয়াছেন "কেশ উঠিতে আরম্ভ করিলে এ তৈল ব্যবহারে আর উঠে না।" প্রশংসা করিবার বিশেষ কিছু যেখানে থাকে না, সেখানে আমরা "এই ব্যক্তির উন্নতির কথা শুনিলে

সুখী হইব, এই ঔষধের বহুল বিক্রয় কামনা করি” ইত্যাদি লিখিয়া পাদপূরণ করিয়া থাকি।

পাদপূরণের পরিবর্ত্তে যেখানে প্রশংসা উদর পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা নানা ভাবে, নানা আকারে দেখা দেয়। আপনি আপনার ছেলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পটলা কেমন পড়িতেছে?” মাষ্টার মহাশয় অকপট চিত্তে বলিলেন, “পড়ে ভাল; কিন্তু মনোযোগ তাদৃশ নাই। যদি মনোযোগ দিত, তবে ক্লাসে ফাষ্ট, সেকেণ্ড হইতে বাধা ছিল না।” ঐ “যদি” তাঁকে এ যাত্রা বাঁচাইয়া দিল। এইরূপ যদ্যাত্মক প্রশংসা অনেক আত্ম-প্রসাদের মূল। অমুক যদি উকীল হইতেন, তবে আজ ডাঃ ঘোষকে পলায়ন করিতে হইত। অমুক যদি চাকরীর পরিবর্ত্তে লেখনী ধরিতেন, তবে বঙ্গসাহিত্যের শ্রী অন্যরূপ হইত, ইত্যাদি অতি নিরাপদ্র রকমের প্রশংসা। আমরা নিজেরাও কখনও কখনও এইরূপ ধারণায় লইয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠি—“হ’তে পারতাম মস্ত একটি কবি” ইত্যাদি।

প্রশংসার ফল যেখানে ফলে, সেখানে প্রত্যক্ষ। আপনার বই বাজারে চলে না। কবিবর পরমানন্দকে অথবা বাগ্মিবর

শ্যামানন্দকে উৎসর্গ করুন। কিছু কাটিবে। পাঠ্যপুস্তক করিতে চান, শ্রীল শ্রীযুক্ত মহোদয়কে নানা বিশেষণ ও উপাধি সহকৃত পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা উৎসর্গ করুন। অব্যর্থ। গায়ককে সুখ্যাতি করুন, দুই একবার বাহবা দিন, গায়কের চক্ষু আপনাকে অন্বেষণ করিবে। গায়ক, বাদ্যকর, শিল্পী কিছু প্রশংসার প্রত্যাশী। বাহবা ব্যতীত গান জমে না।

শুধু গায়কের দোষ দিব কেন? প্রশংসার সুযোগ পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষেই কঠিন। যাঁহারা প্রশংসালাভের অধিকারী, তাঁহারা এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহেন না কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহারা অধিকারী নহেন, তাঁহারাও এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। এমনই দুরন্ত নেশা! যিনি বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনি বক্তৃতা করিবার লোভ সামলাইতে পারেন না। যিনি গান করিতে পারেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সুর ভাঁজিতে থাকেন। আর যিনি বক্তৃতায় তেমন অভ্যস্ত নন, তিনি অন্ততঃ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার প্রসঙ্গে দশ মিনিট বলিতে চান। গান না করিতে পারিলেও পাখোয়াজের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাইয়া সোমে তাল হাঁকড়াইবার জন্য ব্যগ্র।

মুদ্রাদোষ

প্রশংসার এক অভিনব সুযোগ আজকাল দেখা যাইতেছে —অপরকে দিয়া গ্রন্থের ভূমিকা লেখাইয়া লওয়া। এ প্রথাটি মন্দ নয়—ইহাতে আহার ঔষধ দুইই হয়। যাঁহাকে ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তাঁহাকে বেশ আর্টের সহিত প্রশংসা করিয়া লওয়া হইল। তিনিও সস্তায় কিস্তী পাইয়া গভীর গবেষণা জুড়িয়া দিয়া নিজের প্রশংসা প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া লইলেন, এবং গ্রন্থের সম্বন্ধে অবান্তর ভাবে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে গ্রন্থকারেরও হয়ত সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে একটু চৈতন্য হইল। আমার ইচ্ছা আছে, একখানি গ্রন্থ লিখিয়া উঠিতে পারিলে বড় বড় লোকের Symposium জুটাইয়া, জবাকুসুমের প্রশংসা পত্রের আকারে একটি ভূমিকা লেখাইয়া লইব।

প্রশংসা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি, কিন্তু আমার এই বাক্যজালে সে ত ধরা পড়িল না। কত বার জাল ফেলিয়াছি ও ফেলিতেছি, কিন্তু সে শফরী একবার সূর্য্য-কিরণে বিদ্যুৎ খেলিয়া জালের ফাঁক দিয়া পলাইয়া যায়। জালে বাধিয়া আসে গুল্ম, শম্বুক ও কর্দ্দম।

জাল না ফেলিয়া, যখন কমলাকান্তের মত চক্ষু মুদিয়া নিরীক্ষণ করি, তখন দেখি প্রশংসা ফুলের মত ফুটিয়া

রহিয়াছে। আমরা যেন প্রশংসাকে ফুল বলিয়াই মনে করি। ফুলে পৃথিবীর কোনও কাজই হয় না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা ধনী দরিদ্র সকলেই কিন্তু ফুলের লোভে মুগ্ধ। ফুলে সন্তুষ্ট হয় না কে? কিন্তু ফুল দেবপূজায় লাগিলেই তাহার ফুল-জন্ম সার্থক। তাই বলিতেছি ঐ প্রশংসার ফুলরাশি ঘরে লইয়া গিয়া কাজ নাই। উহা ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া বিদায় লই।

উপসংহারে একটি কথা বলিতে চাহি; প্রশংসা সূত্রে ভুলক্রমে যদি কাহারও নিন্দা করিয়া ফেলিয়া থাকি, তবে তাহা ব্যাজ-স্তুতি বলিয়া সহৃদয় বন্ধুগণ গ্রহণ করিবেন এই অনুরোধ।

ফলিত-জ্যোতিষ।

আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তাহা পদার্থ নহে। বোধোদয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রথম প্রভাতে এ সকল পদার্থ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু এখন, জ্ঞানের অপরাহ্ণ বেলায় সে সবই অপদার্থ—তুমি আমি সব। ন্যায়শাস্ত্রের সপ্ত পদার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্টাইয়া দিলেন; আর আমরা বিদ্যা-সাগরী ব্যবস্থা রদ্ করিয়া বলি, পদার্থ বড়ই বিরল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া শেষে বলিয়াছিলেন, চেতন পদার্থের সাধারণ নাম "জন্তু"। এরূপ স্পষ্টবাদিতা দুর্লভ!

বস্তুতঃ 'পদার্থ' আজকাল উবিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। পদার্থবিদ্যায় আমরা 'পদার্থ' 'পদার্থ' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি। "কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বল্‌তে হবে।" আপনারাই বলুন না, সে পদার্থ নিতান্ত জড়, একঘেয়ে, আড়ষ্ট নহে কি? তবে আর অপদার্থ হইতে বাকী রহিল কি?

ফলিত-জ্যোতিষ

ফলিত-জ্যোতিষের গোড়ার কথাটি এই যে, পদার্থ নাই, —শুধু ছায়াবাজি। বায়স্কোপের পটে যেমন। ছায়া দেখিয়া আমরা ভাবি পদার্থ, কিন্তু কোথায় বা পদ, কোথায় বা অর্থ? সকলেই "পদ" আর "অর্থ" খুঁজিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চষিয়া ফেলিবার যোগাড় করে। এত যে শ্রম, এত যে মারামারি কাটাকাটি, কিসের জন্য? "পদ" আর "অর্থ" চাই। পদ হইলেই অর্থ আসে শুনিয়াছি, এবং অর্থ হইলে পদ গজায়; কিন্তু পদ ও অর্থ কতক হইলেও আমরা আরও অপদার্থ হইয়া পড়ি। ব্যাকরণ এখানে হার মানে। সন্ধির সূত্রের মাঝখান থেকে পদার্থের পূর্ব্বে কোথা হইতে যে একটি স্বরে 'অ'র আগম হয়, বুঝা যায় না।

"ফলেন পরিচীয়তে" বড় খাঁটি কথা। ম্যালেরিয়া সারিবে কিনা, তাহা 'ফলেন পরিচীয়তে'; মাঝখান থেকে এক টাকা সাড়ে আট আনার কোনও ভুল নাই, কেন না ফলের সঙ্গে পরিচয় পাইতে হইলেই যে মাশুল চাই; পরে সেটা সুফলই হউক আর কু-ফলই হউক। মানুষ যদি ফলের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক কাজ সফল হইত; কিন্তু তাহা ত পারে না, তাই ফলিত জ্যোতিষ চাই। ফল ফলিবার আগে থেকে তাহার আস্বাদ পাইতে চাই। যদি

কোনও রকমে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় ব্যূহ ভেদ করিয়া দূর চক্রবালের নিম্নে ভবিষ্যতের কুঠুরীতে কি রহস্য আছে, তাহা একবার চট করিয়া জানিয়া লইতে পারি! এই দুরাশা! করকোষ্ঠি, কপাল রেখা, প্রভৃতি দেখিয়া, খড়ি পাতি জুড়িয়া, ঝাঁ করিয়া ভবিষ্যতের ভাণ্ডার লুটিয়া আনিবার যে ব্যবস্থা, তাহারই নাম ফলিত জ্যোতিষ।

কিন্তু এ ফলিত জ্যোতিষ আজকাল আর বড় ফলে না। আগে এক পোয়া আতপ চাউল, এক ছটাক ঘি, ও পাঁচটি পয়সা দৈবজ্ঞ ঠাকুরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও টঁ্যাকে গুঁজিয়া দিতে পারিলে অনেক জিনিষ ফলিত। আজকাল এ সব বুজরুকী আর চলে না। সেই জন্য আমি বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ফলিত-জ্যোতিষের একটি পরিমার্জ্জিত, ও পরিবর্জ্জিত সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টায় আছি; তাহারই ভূমিকামাত্র আপনাদের সমীপে পেশ করিতেছি। ফলিত জ্যোতিষে সংখ্যা-গণিত, বীজ-গণিত, অঙ্কুর গণিত ইত্যাদি অগণিত প্রকারের গণিত লাগে। আমার এই জ্যোতিষ তত্ত্বের জন্য একটু রসায়ন লাগে মাত্র, সে রসায়নও আপনারা যোগ করিয়া লইবেন।

রাস্তায় কত লোকই চলে; লোক চলিতে চলিতে রাস্তাও যেন চলিতে আরম্ভ করে;—বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, পথ

যেন ক্রমাগতই চলিয়াছে। চারিদিকের সুপ্ত বিশ্বের বুকের উপর দিয়া বেচারা পথ যেন পথের খোঁজে অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। যদি কেহ পথের সঙ্গে না ছুটিয়া, পথের ধারে বসিয়া একবার চলন্ত পথের সজীবতার প্রতি দুদণ্ড চাহিয়া থাকে, তবে ফলিত জ্যোতিষের অনেক তত্ত্বই সে মুখস্থ করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু সকলেই পথের পথিক, পথের সঙ্গে চলে, বসিবার সময় কাহারও বড় নাই। থিয়েটার কি সার্কাসে লোক যায় থিয়েটার বা সার্কাস দেখিতে,—সময় সময় নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে। কিন্তু কেহ যদি থিয়েটার না দেখিয়া, যাহারা থিয়েটার দেখিতে যায়, তাহাদের একটু দেখে, একটু তাহাদের দিকে নজর রাখে, তবে ফলিত জ্যোতিষ সহজেই তাহার করায়ত্ত হইয়া পড়ে। শুধু একটু থেমে,—একটু ধীরে!

আজ এই পূর্ণিমা সম্মিলনে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের অপাঙ্গ দৃষ্টি ঐ কক্ষটির দিকে চকিতে একবার যাচাই করিয়া আসিতেছে। ফলিত জ্যোতিষ গণিয়া বলিতেছে যে, ঐ কক্ষটিতে ঈশান কোণে কোনও কাষ্ঠাসনের উপরে বা নিম্নে মৃৎপাত্রে বা কদলীপত্রে অথবা উভয়ত্র ভোজন-যোগ্য সুস্বাদু অথচ প্রচুর কোনও মিষ্ট বা লবণাক্ত দ্রব্য

সজ্জিত রহিয়াছে। 'দীন ধামে' পূর্ণিমা সম্মিলনের নামে যে অনেকের রসনা আর্দ্র হইয়া উঠে, ইহাও ফলিত-জ্যোতিষ। তাহা না হইলে, লোকের অনুমান সত্য হয় কেন?

গুরু ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া যখন আশীর্ব্বাদের ঘটা বাড়াইয়া দেন, তখন বুঝিতে হইবে যে বার্ষিকের দরুণ এক টাকায় এবার কুলাইতেছে না। আর হরিদাস পাল মহাশয় যখন চাঁদার খাতায় অম্লান বদনে বিশ হাজার টাকা সহী করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার মস্তকের উপর রায় বাহাদুরী ছত্র ঝুলিতেছে, নিশ্চয়। কোনও Public meetingএ যখন দেখিবেন, যে একজন হয়ত চেয়ারে বসিয়া শয্যাকণ্টক-গ্রস্ত রোগীর মত ছটফট করিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে যে, তিনি একটুখানি ফুরসুদ পাইলেই ঝাঁ করিয়া উঠিয়াই বক্তৃতা করিতে লাগিয়া যাইবেন; এবং দেখিতে পাইবেন যে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সজোর করতালি যতই প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারের সূচনা করিতেছে, ততই দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তিনি তাঁহার নিরুদ্ধ বক্তৃতার স্রোত ছাড়িয়া দিতেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে, ইহাদের গ্রহের শান্তি করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সবই ছায়াবাজি; এই ছায়াবাজিতে

বড় ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। কিছুই ঠিক করিবার যো নাই। কাহারও নিকটে আপনি হয় ত পরামর্শের জন্য গেলেন; আপনি মহা সমস্যায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া, একান্ত আগ্রহের সহিত, তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি তখন গণিয়া ঠাহর করিতেছেন যে কোন্ পরামর্শটি আপনার সংকল্পের অনুকূল। প্রতিকূল হইলে পাছে আপনি পরামর্শটি প্রত্যাখ্যান করেন, এই তাঁহার মনে ভয়। Delphic oracleএর মত পরামর্শই আজকাল পাওয়া যায়, খাঁটি পরামর্শ মেলে না। সংশয়ের তাড়নায় আপনি যখন একটু শান্তির আশায় কোনও সদাশয় ব্যক্তির সঙ্গ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন সেখানে গিয়া শুধু কথামালা বা হিতোপদেশের গল্প শুনিয়া আপনাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি এমন মুখোস পরিয়া রহিলেন, এমন সব আত্ম-বিজ্ঞাপন তিনি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সঙ্গ-সুখের লালসা, প্রাণের যোগের আশা কোথায় বাষ্প হইয়া মিলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা নাই। মানুষ যদি এই মুখোস ত্যাগ করিয়া, এই পোষাকী ব্যবহার দূরে রাখিয়া, একবার মনে মনে, প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিত!

ফলিত জ্যোতিষ এই মুখোসের অন্তরাল থেকে, পোষাকী

পরিচ্ছদের ভিতর থেকে, আসল জিনিষটা—তা পদার্থই হউক, আর অপদার্থই হউক—টানিয়া আনিবার চেষ্টা করে। আমার বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার বন্ধু যখন পোষাকের বাহার দিয়া, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পৃথিবীকে গণিয়া গণিয়া পদাঘাত করিতে করিতে যান, তখন বুঝিতে পারি যে, তিনি চটক দিয়া চুম্বকের মত পয়সাকে আকর্ষণ করিতে চাহিতে-ছেন। কিন্তু পয়সা যে তামা, লোহা ত নয়! পয়সা ধরিতে চুম্বক চাহি না, পশার চাই; চ'ালের পসরা কতক্ষণ বহা চলে? ডাক্তার যখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া motor কিনিয়া বসিলেন, এবং ডবল ফি হাঁকিয়া বসিলেন, তখন আশা হইল যে, এইবার পসার হইলেও হইতে পারে। সব মিথ্যা, সব ভেল্‌কি!

যেখানে আবার বিনয়ের ছায়াবাজি আছে, সেখানে, জ্যোতিষী, সাবধান! আজকাল সমাজই বল, সাহিত্যই বল, বিনয়ের আবরণে একেবারে পানা পুকুরের মত হইয়া পড়িয়াছে। ভিতরে জল আছে কি পাঁক আছে, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কত কাল নরনারী যে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। বিনয় যে সভ্যতা। সভ্যতা দিয়া আমরা কেবল

আসল জিনিষকে চাপা দিতেই শিখিয়াছি। বিনয় যে সৌজন্য, সৌজন্যের পাষাণ চাপে ভিতরের অঙ্কুরগুলি নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া গেল যে! গান করিতে বলিলে বিনয়, বক্তৃতা করিতে বলিলে বিনয়, আহারে বসিলে বিনয়, রাস্তায় দেখা হইলে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী অভিনয়ের সঙ্গে বিনয়,—বিনয়ে বিনয়ে অস্থির! আজকাল অনেক বক্তৃতার ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে হয় উপসংহার হইতে; কারণ আগাগোড়াই প্রায় বিনয়ে আচ্ছন্ন থাকে। যাঁরা গান গাইতে পারেন, তাঁদের বিনয় ত প্রসিদ্ধ। প্রথমেই ত বলিয়া বসেন, যে গান গাইতে জানেন না; তারপর অনেক সাধ্য সাধনার পর যদি বা গান গাইতে রাজী হইলেন, তখন বিনয়ের ঝোঁকে নানাবিধ কসরৎ করিয়া গানের যে সরল শুভ্র উদারতা, তাহার আন্ত-শ্রাদ্ধ করিয়া বসিলেন! তবে বিনয় দেখিলেই যে গায়ক অনুমান করিতে হইবে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন কথা কখনও বলে না। আপনারা দেখিয়া থাকিবেন, রাস্তায় চলিতে চলিতে কতকগুলি লোক জ্বরগ্রস্ত ভালুকের মত কম্পিত, অনুনাসিক সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়াছেন; তাঁহারা সব সময়ে যে গায়ক, তাহা নহে; তবে হইতেও পারেন। সেই রকম, ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে যাঁহারা অনর্গল আবৃত্তি করিতে

করিতে, গৃহকর্ম্মের তাড়নায়, বাজার করিতে চলিয়াছেন, তাঁহারাও যে এক একজন মস্ত actor, এমন কথা জ্যোতিষ বলে না। তবে হইতেও পারেন, কিছুই বলা যায় না।

ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, "রোগটা একটু কঠিন বটে ; তা' আস্তে আস্তে অবশ্য ভগবানের ইচ্ছায় ভাল হয়ে যাবে। আজ ত ঐরকম ব্যবস্থা চলুক, কাল আবার ত আস্‌ছি,—দেখা যাক্।" তাঁহার ললাটের রেখা, 'ফিয়ের' জন্য হস্তের ব্যগ্রতা এবং নাড়ী ছাড়িয়া গাড়ীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি, ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তবে রোগীর প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিবেন।

মাষ্টার মহাশয় অবশ্য নিরীহ, ভাল মানুষ, পণ্ডিত, আজ-বোঝ গোছের লোক, এটা চিরকালই জানা আছে। ছেলেরা ভাবে, মাষ্টার পড়িতে পড়িতে, আর সব ভুলিয়া মারিয়া দিয়াছে। জগৎ ভাবে, উহাদের যেতে দেও, ওরা গো-বেচারী। কিন্তু জ্যোতিষ বলে, সাবধান! মাঝে মাঝে বর্ণ চোরা আম ত আছে। আগে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া, তবে সিদ্ধান্তটা আঁটিও। জগৎ যাহা ভাবে, ছেলেরা যাহা ভাবে, মাষ্টারেরা তাহারই সাজ পরিয়া বসিয়া থাকে,—গম্ভীর জড়, নিরুপায়! যদি এই সাজা পোষাক ফেলিয়া কেহ কেহ

একটু বাহিরে আসিয়া দুনিয়াদারীর সন্ধানটা দেখিয়া লইতে চাহে, তবে, দোহাই তোমাদের, তাহাকে যেন ভুল বুঝিও না।

ভবের বাজারে জিনিস চিনিবার উপায় নাই ; তাই একটু আধটু জ্যোতিষ চাই বই কি ! এ বাজারে ত জিনিসের কেনা বেচা হয় না, কেনা বেচা হয় বিজ্ঞাপনের। মাসিকে, সাপ্তাহিকে, পঞ্জিকায়, প্রাচীরে, পুস্তকে, প্লাকার্ডে, ট্রামে, বায়স্কোপে—কেবল বিজ্ঞাপন। এই কৃষিপ্রধান দেশে ধানের চাষ, পাটের চাষে যাহা না ফলে, তাহা বিজ্ঞাপনের চাষে ফলে। কিন্তু মজা এই, সকলেই বলে—বিজ্ঞাপনে ভুলিবেন না। সকলেই বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরকে ঘৃণা করেন ; তবুও কিন্তু বিজ্ঞাপন কমে না, বিজ্ঞাপনের হার কমে না। বিজ্ঞাপনের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। বিজ্ঞাপনের খাতিরে কত মাটী সোণার দরে বিকাইয়া যায়। দেশের পচা তৈল একটু বিলাতী এসেন্স মাখিয়া সুন্দরী ললনাগণের মাথায় উঠিয়া বসিয়াছে। কেবল বলিতে পারিলে হইল, কাশ্মীরের কুসুম, জাপানের প্রস্ফুটিত শকুরা পুষ্প এবং সিরাজি-গোলাপ চয়ন করিয়া তাহার নির্য্যাস হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রস্তুত। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে সময়ে

সময়ে ভাষার চটুলতায় অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি বাহির হইয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, যাহারা এই সব বিজ্ঞাপন লেখে, পরে তাহারা হয় actor না হয় নাট্যকার হইয়া উঠে। যাহা হউক, এই সকল বিজ্ঞাপনের বহর দেখিয়া কোনও পদার্থেরই খোঁজও পাওয়া যায় না, সব অপদার্থ, সব বিড়ম্বনা।

আপনারা, যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ আমার এই ফলিত জ্যোতিষ শ্রবণ করিলেন, হরপার্ব্বতীর কৃপায় ইহ-কালে অর্থ ও পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আপনারা শুনিয়াছেন কি না, সে কথা আপনারাই ভাল জানেন। আমি চেষ্টা করিলে অবশ্য গণিয়া বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ খরচ আছে। আপনাদের সকলের মুখে এক রকম ভাবই প্রকট নহে। কাহারও দৃষ্টি প্রসন্ন, কাহারও উদাসীন, কেহ অবহিত, কেহ অন্যমনস্ক, কেহ শুনিতেছেন, কেহ বা অন্য জিনিষ ভাবিতে-ছেন; আর আমি—আমি যে বাক্য-জাল রচনা করিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে এই জ্যোৎস্না-পুলকিত সন্ধ্যায় আপনাদের দুই চারিটি মুহূর্ত্ত অপহরণ করিতে, ধীরে, সন্তর্পণে সন্দেহে অগ্রসর হইতেছি, আপনারা যদি ফলিত জ্যোতিষ

জানেন, তাহা হইলে নিশ্চিত বলিতে পারিবেন যে, সে কেবল আপনাদের ঐ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় করতালি লাভ করিবার জন্য।

যন্ত্র ও জীবন

আহারের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধারও যথেষ্ট উদ্রেক হইয়াছে, এমন সময় নদীপার হইয়া আপনারা কখনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন কি ? মানুষের বিচিত্র অদৃষ্টে এমনও কখনও কখনও ঘটে যে, আপনিও যখন নদীর কিনারে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন খেয়া ভাঁটার টানে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে ; অপরাহ্ন হইয়া গেল, তবুও খেয়া দেখা দিল না ; আপনি তীরে বসিয়া ভাবিতেছেন, কখন খেয়া আসিবে, কখন পার হইয়া গিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিব। আমার অবস্থাও সেইরূপ ; ব্যোমকেশ বাবু আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া তাহার সহিত এমনই একটি ব্যাপার জুড়িয়া দিয়াছেন যে, সে নদীপারের মত ভীষণ। আমি ব্রাহ্মণ নই, সুতরাং শুধু নিমন্ত্রণের নাম মাত্রেই যে বিচলিত হইয়া উঠিব, সেরূপ স্বভাব নহে। উপনয়নে ব্রাহ্মণের অনুকরণ করিতে Glasgowর সস্তা সূত্রই যথেষ্ট, কিন্তু নিমন্ত্রণ ব্যাপারে তাঁহা-দের উপর টেক্কা দিতে হইলে অনেক তপস্যার প্রয়োজন

হইবে। ব্যোমকেশ বাবু এই নিমন্ত্রণের সঙ্গে একটি প্রলোভনজনক আহার্য্য তালিকা বা মেনুও জুড়িয়া দিতে ভুলেন নাই। সে প্রলোভন সংবরণ করা, আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি—কোনও ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব—তা' সে যে জাতিরই লোক হউক না।

নিমন্ত্রণের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম সংযোজিত না হইলে তত ভয়ের কারণ ছিল না। চিঠিখানিতে ঠিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপ ছিল কি না, ভাল করিয়া দেখিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না; কিন্তু ব্যোমকেশ বাবুর স্বাক্ষরই যথেষ্ট। ব্যোমকেশ বাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য- পরিষদের সংক্ষিপ্ত, সচিত্র ও সুলভ সংস্করণ। স্বভাবতঃই প্রবন্ধ লিখিবার ভাবনায় আকুল হইলাম এবং ব্যোমকেশ বাবু যাঁহাদের অগ্রদুত, তাঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণের আসরে, ওরফে প্রবন্ধ সভায় দেখিতে পাইব, সে আশঙ্কাও মনে জাগিয়া উঠিল। দেখিতেছি আমার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই।

নিমন্ত্রণের লোভে এই যে এত বড় ভাদ্রমাসের ভরা নদী, সাঁতার দিয়া পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মরিব কি না, তাহা আপনাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। পার ঘাটের খেয়া না মিলিলেও, আপনাদের কৃপায় লাল ডিঙ্গিখানা পাইলে

নিঃসন্দেহে পাল খাটাইয়া অনুকূল পবনে তীরে ভিড়িতে পারিব।

আমি যে বিষয় লইয়া আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা অতি গুরুতর—গুরু"তর" বলিতে যেন তুলনা বুঝিবেন না। আর কেহ যদি আজিকার সভায় কোনও গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রয়াসী থাকেন, তবে আমি মাঝখান থেকে এই "তর" প্রত্যয়ের বেতরো তর লাগাইয়া বাহাদুরী লইতে ইচ্ছা করি না। ভাষাতত্ত্ববিদেরা এই "তর" সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই, তবে আমার বোধ হয় যে এখানে "তর" প্রত্যয়ের মধ্যে তুলনায় সমালোচনার ভাব নাই। "গুরুতর" সম্ভবতঃ "কেমন তর" "বেতর" ইত্যাদির সঙ্গে এক খেয়ায় আসিয়া কিছু অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'গুরু'র কৃপায়ই এইরূপ ঘটনা, ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

মাপ করিবেন, "যন্ত্র ও জীবনের" বড় রাস্তা ছাড়িয়া ভাষা-তত্ত্বের পয়োনালার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছি। পানদোষও আপনাদের সঙ্গগুণে ঐরূপ হইয়া থাকিবে।

"জীবন ও যন্ত্র" সাধারণতঃ দুইটা বিরুদ্ধ ধর্ম্মাত্মক পদার্থ। যন্ত্র জড়, জীবন অ-জড়। জীবনে এমন কিছু আছে যাহা

যন্ত্রে নাই। জীবন নহিলে যন্ত্র চলে না। কোন্ দিন চলিবে বিচিত্র কি? কিন্তু সেই কথা ভাবিলে আরও দুঃখ বেশী হয় যে, যখন জীবন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকারী হইবে, তখন আমরা তাহার ফলভোগ করিতে রহিব না। দশশালা বন্দোবস্তের মেয়াদী ইজারাদারদের যে লোকসান হইবে, তাহা পূরণ করিবার জন্য ভগবানের Supreme Government কোনও ব্যবস্থা করিবেন কি না কে জানে?

আপাততঃ যন্ত্রাবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে জীবনের কাল বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা মোটেই বোধ হয় না। বরং জীবনের পরিমাণ কিছু সংক্ষিপ্তই হইয়া যাইতেছে। রেলগাড়ী দেশে ম্যালেরিয়ার চাষ করিতেছে। কলের জলে Dyspepsia বহিয়া আনিতেছে; এই বিদ্যুতালোক হয় ত চক্ষুর আদ্য শ্রাদ্ধ করিতেছে এবং কলকারখানার চাকরী করিয়া লোকে স্বল্পায়ু হইতেছে। ঘটিকা যন্ত্র সময়কে একেবারে কলের মধ্যে অহোরাত্র পিষিয়া তিল তিল করিয়া বাহির করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু জীবনের পরিমাণ এক তিলও বাড়াইতে পারিতেছে না। সে কালের লোক বহুদিন বাঁচিত, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ঘটিকা যন্ত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে আমরা কবরের দিকে (অর্থাৎ নিমতলায়

দিকে) কিছু সকাল সকাল অগ্রসর হইতেছি, ইহা বলিতে হইবে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া থাকিলে লোকে সব বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত punctual হইয়া উঠে!

এই যে জীবন, যন্ত্রের সাহায্যেও দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেছে না, ইহাতে ক্ষোভ করিবার কারণ না থাকিতে পারে। জীবন যদি দৈর্ঘ্যে না বাড়িয়া গঙ্গার ইলিসের মত প্রস্থে বাড়ে, তবে তাহার মূল্য অনেক বাড়িয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এই প্রস্থই এক হিসাবে অমরতা। আগে যেরূপ যানের বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে যেখানে যাইতে তিন মাস লাগিত, এখন সেখানে তিন দিনে যাওয়া যায়। একখানি পুঁথি নকল করিতে আগে দুই বৎসর কাটিয়া যাইত ; লেখক অব্যাহতির চরম সুখ উপভোগ করিয়া গর্ব্বের সহিত নিজের নাম, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম, সমাপ্তির পঞ্জিকা, অর্থাৎ বার তিথি নক্ষত্র সাল ইত্যাদি দিয়া পুঁথি নকল শেষ করিতেন , এখন মুদ্রাযন্ত্র, অক্ষরযন্ত্র type writer প্রভৃতির কৃপায় সে বিষয়ে আর সময় যায় না।

পূর্ব্বে অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া, অনেক খাটিয়া তবে একটি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যাইত। জীবনের অনেকখানি একটি তত্ত্ব জানিতেই কাটিয়া যাইত—এখন

পাণ্ডিত্য সস্তায় বিকাইতেছে। একখানা Encyclopaedia Britannica টানুন,সব একেবারে চোখের সামনে দেদীপ্যমান। বই টানিবার জন্য বৃথা সময় ক্ষেপ করিবার দরকার নাই, ঘূর্ণ্যমান পুস্তকাধার (Revolving Bookcase) আপনার জন্য সে ব্যবস্থা করিবে। আপনি আরও ঘুরিতে চান, ঘূর্ণ্যমান চেয়ারের ব্যবস্থা করুন। আপনাকে লইয়া চেয়ার ঘুরিবে, book case ঘুরিবে। ক্রমাগত ঘুরুন। চিন্তা কি ? আপনার মাথা ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলই ঘুরিতে থাকুক। সময়ের মূল্য এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। একটি রেলের রাস্তায় লণ্ডনে পৌঁছিতে যে সময় লাগিত, তাহা আঠার মিনিট কমাইবার জন্য আশী লক্ষ টাকা খরচ করিয়া নূতন রেলপথ প্রস্তুত হইল। এইরূপে নানা উপায়ে সময়ের উপরে দাবী বাড়িয়া যাইতেছে। নানা যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের হাতে সময়ের লাগাম তুলিয়া ধরিতেছে। আমরা পাঁচরকম কাজের মধ্য হইতে সময় বাঁচাইয়া আর পাঁচ রকম কাজে লাগিয়া যাইতে পারিতেছি। এই যে অল্প সময়ে অধিক কাজ করিবার ক্ষমতা, ইহাকেই জীবনের প্রস্থ বলা যায়। এই প্রস্থ হিসাব করিয়া যদি আপনি দেখেন যে, আপনার অনেক কাজ করিবার সম্ভাবনা আছে ; তাহা হইলেই ত

আপনি অমর, আর কথাটি বলিবার যো নাই! হইলই বা কিছু সকাল সকাল ছুটি, পরকালে গিয়া ততক্ষণ Retirement এর বিশ্রাম সুখ অনুভব করুন।

আর একটি কথা এই যে, এখন পরমায়ু কমিয়া আসিতেছে, এ কথা যদি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলে পরে যে বাড়িবে না সে কথা বলিবার কারণ নাই। জীবনের গতি বিচিত্র। সরল সোজা সিঁড়ি দিয়াই যে সে অমরতার সপ্তম স্বর্গে উঠিবে, তাহা না হইতেও পারে। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলপথের মত কখনও নামিয়া কখন উঠিয়া হয়ত উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছিবে—অথবা কর্কটের ন্যায় পিছু হাঁটিয়াও অনেক পথ অগ্রসর হইয়া যাইবে। জীবন কমিতে কমিতে বাড়িয়া উঠিবে! কিছুই বলা যায় না।

এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বলিতে হয় যে কমিবার দিকেই যেন কিছু বেশী ঝোঁক। যন্ত্রের সাহায্যে সময়ের সংক্ষেপ করিয়া করিয়া ক্রমে এমন অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে যে, হয়ত এখন যাহা পঞ্চাশ বৎসরে শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না তাহা পাঁচ বৎসরে সমাধা করিয়া দ্বিতীয়বার দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই হাসিতে হাসিতে ভবধাম ত্যাগ করা যাইবে! সুতরাং আকর্ষী দিয়া বেগুন পাড়িবার কল্পনা

মিথ্যা না হইতেও পারে। এখনই যেরূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনেক কাজ পাঁচ বৎসরের শিশু করিতে পারে—যাহা পূর্ণবয়স্কদিগের সমবেত শক্তিতেও কুলাইত না। মনে করুন knobটি টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিতে, পাখাটি ঘুরাইয়া দিতে, টেলিফোনে চাবি দিতে, মোটরের স্বইচ টানিয়া দিতে, এমন কি যুদ্ধ জাহাজের কামান ছাড়িবার ব্যাটারীর দুইটি তারের মুখ সংলগ্ন করিয়া প্রলয়ের অভিনয় করিতে পাঁচ বৎসরের শিশুই যথেষ্ট।

সময়-সংক্ষেপের কথায় যানের সুবিধার কথা মনে হয়। রেলগাড়ীই ত যথেষ্ট বিস্ময়জনক। আবার মোটর আসিয়া বিপ্লব বাধাইয়াছে। শুধু যে বেগ বাড়াইবার জন্য আমাদের উদ্বেগ তাহা নহে, আমরা মাটিতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া মাটী হইয়া যাইতে বসিয়াছি। এখন চেষ্টা উড়িতে। আগে সেটা কেবল অহিফেনের প্রসাদে হইত, এখন সেটা যন্ত্রের সাহায্যে জাগ্রত অবস্থায়, হইতে বসিয়াছে। বড়লোকের ছেলেদের "উড়িবার" আর এক নূতন পন্থা হইয়া দাঁড়াইল। যেখানে খুসী রাত্রে দুপুরে অতর্কিতে শূন্যমার্গে গিয়া অতিথি হও, আর পরোয়া নাই! যানের গতি যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে, তাহাতে কি যে গতি হইবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। হয়ত

দেখিব—অবশ্য যদি বাঁচি—যে রেলগাড়ী গুলি ধাউসের মত মিউজিয়মে archaeological sectionএ বিরাজ করিতেছে, আর বায়ব জাহাজ পঙ্গপালের মত গগন ছাইয়া ফেলিয়াছে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য আর ষ্টেশনে যাইতে হইবে না, টিকিট কাটিতে হইবে না, একখানা পাখাওয়ালা চাকা ভাড়া করিয়া পিঠে বাঁধিয়া, স্বচ্ছন্দে ক্লাস অনুসারে, ১৫ কি ২০ সের ভার লইয়া উড়িয়া চল। বিছানা বিনা মাশুলে যাইবে। মনে করুন, মেম সাহেবেরা যেমন মাথায় প্রকাণ্ড টুপী পরেন তেমনি পিঠে. একখানা উড্ডীয়মান চাকা বাঁধিয়া উধাও হইলেন এবং কাহারও বাড়ীর sky light দিয়া টুপ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অবশ্য গাউন একটু সংযত করিতে হইবে, নচেৎ অভিসারে বাধা হইতে পারে।

আমাদের সুবিধার জন্য, আমোদের জন্য, যে সকল যন্ত্র নিত্য নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার ত কথাই নাই। হার-মোনিয়ম বেহালা পিয়ানো ব্যাঞ্জো প্রভৃতি যে সকল মামুলী যন্ত্র ছিল এবং যাহার মধ্যে কুমারস্বামী সারঙ্গী ও সারেংকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, তাহারা ত এখন সময়ের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এখনকার যন্ত্র হইতেছে গ্রামোফোন,

প্যাথিফোন, জোনোফোন এবং ফোনবংশীয় যাবতীয় যন্ত্র। উহার ঐ প্রকাণ্ড সিঙ্গার মধ্যে সকলপ্রকার যন্ত্র, যথা বেহালা, সানাই, হারমোনিয়ম প্রভৃতি এবং সকল-প্রকার সঙ্গীত—যথা ধ্রুপদ, টপ্পা, হাফ-আথড়াই প্রভৃতি জমাট বাঁধিয়া প্রবেশ করিয়াছে। চাবি লাগাও, আর একাধারে একদম স্বরসঙ্গীতের ও যন্ত্রসঙ্গীতের চরম সুখ উপভোগ কর। গৃহে গৃহে যেরূপ গ্রামোফোনের পসার, এবং অলিতে গলিতে ইহার দোকানের যেরূপ ক্রমিক বিস্তৃতি, তাহাতে সহর শীঘ্র গ্রামোফোনময় হইয়া উঠিবে। তবে তাহা উপভোগ করিতে জনমানব থাকিবে কি না সন্দেহ। চাবি লাগাইবার লোকের কিন্তু অভাব হইবে না।

এইরূপ অনেক যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুবিধা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য হইতেছে কি না, তাহা ভাববার সময় কৈ? সময় যে নাই।

চশমা এইরূপ এক যন্ত্র। হ্রস্বকে দীর্ঘ করিতে এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব করিতে, ইহার ক্ষমতা অসাধারণ। চক্ষুষ্মানকে অন্ধ করিতে এবং অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিতেও ইহার ক্ষমতা আছে, এরূপ শুনিয়াছি। এতদিন চশমা পরিতেছি, দৃষ্টি-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ডাক্তারকে বলিলে,

তিনি উত্তর করিবেন, "ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে, বলেন কি? তাও কি কখনও হয়? চশমা না লইলে চক্ষু যে একেবারে উৎসন্ন যাইত! তবু চশমা লইয়া তেমন খারাপ হয় নাই।" বলা বাহুল্য, তর্কশাস্ত্র এ যুক্তির কাছে হারি মানে।

ফোটোগ্রাফ ছবি তুলিয়া মরকে অমর করিয়া দিতেছে। ছবি ঠিক হউক বা না হউক, অর্থব্যয় নিশ্চিত। আপনার মনোমত হয়, যদি Artist একটু বুদ্ধিমান হয়। চেহারাটি যেমন, ঠিক তেমন করিলে খুব কম লোকেরই মনে ধরে! একবার আমার একখানি ফোটো আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমার মনে হয় সেই আমার ঠিক ফোটো। কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন সেখানি আমার ছবি বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না।

আর এক যন্ত্র গ্রামোফোন। গ্রামোফোন সঙ্গীতের সঙ্‌ পর্য্যন্ত আদায় করিয়াছে, অবশিষ্ট ক্রমে হইবে—চিন্তা কি? Microscope হইয়া রোগ নির্ণয় করার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ইহার সাহায্যে চারিদিকে কীটাণু সকল যে Xerxesএর সৈন্যের মত আমাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে সেইগুলিই বেশ দেখা যাইতেছে। কিন্তু কীটাণুও

চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহে—সেও নিত্য নূতন রোগের সৃষ্টি করিতেছে, যেন Microscope এবং ব্যারামের মধ্যে একটা দস্তুরমত race চলিতেছে। আর একটি সুবিধা এই যে Microscopeএর কৃপায় এক ফোঁটা জল খাইয়াও শান্তি নাই। সেই একটি ফোঁটা জল অসংখ্য পোকায় পরিপূর্ণ। কি বীভৎস! আর এক সুবিধা ইলেক্‌ট্রিক পাখায়। পিলে ফাটা যে ইহার কৃপায় কমিয়াছে, তাহার জন্য এই পাখার আবিষ্কর্ত্তাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু সে টানা পাখার যে আয়েসটুকু তাহা আর নাই। বিচিত্র কারু-কার্য্যমণ্ডিত গুরুগম্ভীরনাদী আলবোলার স্থান চুরুটে যতটুকু পূর্ণ করিতে পারে, তাকিয়ার স্থান চেয়ারে যতটুকু পূর্ণ করিতে পারে, টানাপাখার স্থান এই ঘূর্ণী পাখা তাহা অপেক্ষাও কম পূরণ করিতে পারে। কোথায় সে দুলুনী, কোথায় সে ছন্দ কোথায় সে কাব্য! এ কেবল বাঁইবাঁই শব্দে ঘোরা। এই যে রাস্তায় প্রকাণ্ড বুল ডগের মুখের মত নিতান্ত খাঁদাপানা মোটরগুলা দিবারাত্র চলে, ইহাতেও কি রুচির পঞ্জরগুলি আস্ত থাকে? তোমার আমার মত পদাতিকের জীর্ণ অস্থি চূর্ণ করিতে, পরলোকের নিগূঢ়

সন্ধান বাতলাইয়া দিতে, এমন যন্ত্র আর নাই! ঘুড়ির বাহার গিয়াছে, অশ্বের সে চপলতা, সে সুঠাম গ্রীবাভঙ্গী, সহিসগণের ষড়জ সংবাদীধ্বনি, এসব কি আর ভাল লাগে?

কিন্তু একটী কথা; মোটর যেরূপ দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে তাহাতে ঘোড়ার উপায় কি হইবে? ঘোড়া গৃহপালিত জীব। আমাদের প্রয়োজন অনুসারে উহাদের বংশ বিস্তৃতি। কাজেই ঘোড়া যে ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে যে কার্য্য মানুষের দ্বারা হইত, তাহা যন্ত্রে সমাধা করিতেছে। মানুষের বংশ লোপ পাইবে না ত? কি জানি হয় ত কলই থাকিবে আর চালাইবার মত দুইচার জন লোকও সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে! আর কেহ থাকিবে না। কিছুই বলা যায় না।

এইরূপে যন্ত্রে ও জীবনে একটা বিষম প্রতিযোগিতা জুড়িয়া গিয়াছে। যন্ত্র চায় জীবনের মত হইতে, জীবন চায় যন্ত্রের মত হইতে। যন্ত্র এক রকমেই সাড়া দেয়, অন্য রকমে সাড়া দিতে-জানে না। জীবনের প্রকৃতিই হচ্ছে নানা রকমে সাড়া দেওয়া। অবশ্য জগদীশ বাবু বলিবেন যে যন্ত্র ত জড়; জড়ে আর চেতনে সাড়ার

কোনও প্রভেদ নাই; কিন্তু আমরা কেবল উচ্চশ্রেণীর চৈতন্যের কথাই বলিতেছি। সেখানে জীবন ও যন্ত্রে প্রভেদ অনেক। বড় বড় লোকের জীবনের লক্ষণ এই যে তাহা অনেকটা যন্ত্রেরই মত। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ধরাবাঁধার মধ্যে চলিয়া যায়। খামখেয়ালিপনা নাই। আমরা যখন পড়িতাম তখন মনে করিতাম যে এই বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র। নিয়মের সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একই ভাবে বধিরের মত চলিয়াছে—তুমি পাশ হইবার উপযুক্ত হও পাশ হইবে, ফেল হইবার হও, ফেল হইবে, একচুলও এদিক ওদিক হইবে না। এখন দেখিতেছি বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক যন্ত্র নহে, পরন্তু যথেষ্ট সজীব; ইচ্ছামত, খেয়ালমতই চলে।

সাহিত্য পরিষদের সুদৃঢ় স্তম্ভ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী যন্ত্রবদ্ধ হইতে চলিয়াছে; ক্রমেই সজীবতা পরিহার করিতেছে। *

নৈয়ায়িক প্রবর জেভন্স্ ন্যায়ের এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পক্ষ (Premises) সে কলে ফেলিয়া

* যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষা প্রণালী—সাহিত্য।

দিলে, সাধ্য (conclusion) আপনি বাহির হইয়া আসে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

যন্ত্রের যেরূপ জয়জয়কার হইতেছে, তাহাতে ক্রমশঃ ইচ্ছা ও সুখ দুঃখ প্রভৃতিও যে যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে না, তাহারই বা ভরসা কি ? Laboratory তে যেমন নীল তৈয়ার করিবার প্রথা হওয়ায় নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে, তেমনই যন্ত্রের দ্বারা খাদ্যাদিও বিনা আয়াসে প্রস্তুত হইবে। সূর্য্যের প্রকাণ্ড চুলী হইতে তাপ যন্ত্রের সাহায্যে আটকা পড়িয়া, আমাদের পাকের কার্য্য (যতদিন অন্ততঃ কেমিষ্ট্রী এই পাকের হস্ত হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি না দেয়) করিবে, এবং সমস্ত কলকারখানার ইন্ধন যোগাইবে। যন্ত্রের সাহায্যে সম্প্রতি সূর্য্যের তাপ হইতে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ করিবার কল্পনা হইতেছে।

আমরা এই যে গবর্ণমেণ্টের অর্থে বা ছাত্রদত্ত অর্থে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া লেকচার দি, যন্ত্রের উন্নতি হইলে এমনও হইতে পারে যে আমাদিগের বক্তব্য "ফোন"বংশীয় কোনও যন্ত্রে পূরিয়া আমাদিগকে দুই বা তিন বৎসর পরে পেন্সন দিতে পারে। অনেকটা টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এখন যেমন এক একটি ক্লাসে গোলাকারে কতকগুলি

ছাত্র বসিয়া থাকে এবং মাঝখানে শিক্ষকপ্রবর বিরাজ করেন, তখন হয় ত একটি টেবিলে একটি গ্রামোফোন থাকিবে (বেহারা চাবি দিয়া যাইবে ও রেকর্ড বদলাইয়া দিবে) আর অনেকগুলি ডেস্কের উপর টেলিফোন Receiver থাকিবে। তাহারাই হবে ছাত্র। আসল ছাত্রেরা বাড়ীতে বসিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে কাণের কাছে সেই যন্ত্রটি রাখিয়া নোট লিখিতে থাকিবে। নোট বুক দেখিয়া পারসেণ্টেজ্ দেওয়া হইবে।

মানুষের সুখ দুঃখকেও যন্ত্রের অধীন করা তত শক্ত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সুখ দুঃখ ত অনিত্য। মনে করিলেই সুখ, মনে করিলেই দুঃখ। ঐ মনে করা লইয়াই ত যত গোল। মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ জীব এত যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিল, জলে স্থলে নীল নভস্তলে প্রভাব জাহির করিতে পারিল, আর এই মনে করাটুকুর বেলা পিছপা হইল? লজ্জায় বাক্যরোধ হইয়া আসে! থাক, যদি এই বৈদান্তিক অবস্থায় চিত্তকে তথা সুখ দুঃখকে সমাধিতে ফেলা একান্ত অসম্ভব হয়, তবে যন্ত্রই ইহার ব্যবস্থা করিবে। সুখ দুঃখ কি? এক রকম সাড়া বইত নয়? জগদীশ বাবুর Recorder দিয়া চট করিয়া সেটার আকৃতি বুঝিয়া

লও। তার পরে রুম্‌কফ কয়েলের (Rhumcorf's coil) সাহায্যে সেইরূপ আকৃতির সাড়া মানুষের শরীরে কিরূপে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। Annodeকে cathode করিয়া, cathodeকে annode করিয়া তাড়িতের গতি বদলাইয়া, ফিরাইয়া ঘুরাইয়া, শেষে হয় ত এমন একটা যোগ পাওয়া যাইবে যে তাহার দ্বারা ইচ্ছামত সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখে পরিণত করা যাইবে। তখন জগতের অবস্থা যে কি হইবে, তাহা ভাবিলে আমি ত পুলকে অস্থির হই। একজন দাঁতের গোড়ার যন্ত্রণায় অস্থির, কিন্তু এই যন্ত্রের কৃপায় সে হয় ত হাসিয়াই আকুল হইবে। আর একজন দিবারাত্র আমোদে মত্ত, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে ঘণ্টা কয়েকের জন্য দুঃখের প্রবল তোড়ের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া গেল, তাহার হজমের সুবিধা হইবে।

সেই সময়ের আশা হৃদয়ে বহন করিয়া এবং অসীম ধৈর্য্যের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমি বিদায় লইতেছি।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

আমি যে আজ আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ কষ্ট দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, সে ঠিক আমার দোষে নহে। আমারই কয়েকজন ছাত্রবন্ধু ষড়যন্ত্র করিয়া এ বিপত্তি ঘটাইয়াছেন; তাঁহারা আপনাদের সমিতির সভ্য, সুতরাং আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পরে, আপনারা তাঁহাদিগকে এজন্য যেরূপ ইচ্ছা শাসন করিতে পারিবেন। আমি এই প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদের নাম করিয়া দোষী হইতে পারিব না, কিন্তু সে সকল ষড়যন্ত্রকারী, অনাবশ্যক-রূপে ব্যস্ত, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিতে প্রস্তুত, হারুণ-উল-রসীদের মত মেজাজের লোক দেখিলেই আপনারা কলেজের ছাত্র বলিয়া নিশ্চিত চিনিতে পারিবেন। তাঁহারা যে আমাকে কলিকাতার যাদুঘর হইতে ভবানীপুরের মানব পিতামহশালায় কেন টানিয়া আনিয়াছেন, ইহার একটি সন্তোষজনক কারণ আবিষ্কার করিতে এতদিন চেষ্টা করিতেছিলাম। যাঁহারা প্রায় ৩৬৫ দিন আমার

বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আবার এ নূতন সখ কেন মনে আসিল, তাহাই আমি ভাবিতেছিলাম। ইহা আমার বক্তৃতারই আকর্ষণী শক্তি, এরূপ মনে করিবার মত হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞানশূন্যতা অনেকের থাকিলেও আমার নাই। এতদপেক্ষা যুক্তিযুক্ততর অনুমান এই যে, ইহাঁরা আমার বক্তৃতা তেমনভাবে কখনও শুনেন নাই—নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে "শতকরা" রক্ষা করিয়া সারিয়া আসিয়া থাকেন। পদ্মপত্রের বারির ন্যায় একেবারেই অনাসক্ত! যাক, যে কারণেই হউক আজ এই নববর্ষের প্রথম দিনে আপনাদিগকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাইতে আসিয়াছি। আপনারা অতিথির সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কোনও সভাসমিতিতে এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধরূপে পঠিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আপনারা যদিও বিষয় নির্ব্বাচনে আমার সহিত একমত হইতে না পারেন, তথাপি আমার মৌলিকত্বা আপনারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যেহেতু, যতদূর জানা যায় তাহাতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও সভাস্থলে কোনও বক্তৃতা

বা প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই। আপনারা যদি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা এতটুকু মাপ করেন, তবে আমি প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। বর্ত্তমান যুগে মৌলিকতার ন্যায় আদরণীয় জিনিষ কিছুই নাই। আপনারা যদি ভবানীপুরের সহিত রাণী ভবানীর কোনও যোগ দেখাইতে পারেন, আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত আলিপুরের কোনও ঐতিহাসিক সম্বন্ধ বাহির করিতে পারেন, কালীঘাটের মন্দিরে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন খুঁজিয়া পান, অগত্যা এটা স্থির করিতে পারেন যে শশার আঁসে অতি মোলায়েম কাগজ প্রস্তুত হয়; বা বিড়ালের লোমে বিচিত্র শাল হয়, তাহা হইলে আপনাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হউক বা না হউক, আপনাদের মৌলিকতার সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্যকার এই সান্ধ্যসম্মিলনে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে কিছু নূতনত্ব থাকিলেও, ভ্রমণে বড় একটা নূতনত্ব আর নাই। আজকাল প্রায়ই একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের অন্যতম পেশা ভ্রমণ। বায়ুসেবনই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য। যেখানে সাধারণতঃ মাছ, মাংস, ঘি সস্তা, এই বায়ু-ভোজনকারীদিগের গন্তব্যস্থান সেই সকল

দেশ। বারাণসীতে বেণীমাধবের ধ্বজা বা সারনাথ অপেক্ষা দশাশ্বমেধের বাজারে মৎস্যের দরই ভ্রমণকারীদিগের অধিকতর প্রিয়। বায়ুভোজীদিগের প্রাণ বায়ুর ন্যায় হাল্কা, আহার্য্য বায়ুর অপেক্ষা অনেকগুণ ওজনে ভারী এবং গতি আশুগতিরই ন্যায় দ্রুত এবং হিসাবের বাহিরে।

ভ্রমণের উপকারিতা অনেক; নিষ্কর্ম্মাদিগের কর্ম্ম ভ্রমণ, বহুকর্ম্মাগণের অবসর বিনোদন ভ্রমণ এবং যাঁহাদের কর্ম্ম তত বেশী নহে, তাঁহারা কর্ম্মের ভাণ করিয়া যদি পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন মন্দ হয় না। ভ্রমণের আর একটি উপকারিতা এই যে যাঁহাদের অর্থবাহুল্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে ভ্রমণ safety valveএর কাজ করে। অর্থের ন্যায় ভ্রমণও অঘন-ঘটন-কুশল। সাতঘাটের জল একত্র করিতে ভ্রমণ অদ্বিতীয়। এই প্রখর গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে নির্ব্বাত উত্তাপে নেহাত যদি তোমার দম আটকাইয়া আসে, তবে চট করিয়া পুরীতে কি ওয়ালটেয়ারে সরিয়া পড়। ঝড় বহিয়া তোমার সমস্ত ক্লেশ হরণ করিবে। যদি গ্রীষ্মের ফল আম, তরমুজ, পটলে তোমার অরুচি হইয়া থাকে, তবে ঝাঁ করিয়া একবার দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া এস, কপি, মটর শুঁটি,

কমলা ইত্যাদি শীতকালের ফল তোমার রসনা পরিতৃপ্ত করিবে।

এ সকল জাগতিক ভোগবাসনা যদি না থাকে, তবে লোটা ও কম্বল লইয়া জলধর দাদার মত গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা কর। ফিরিয়া আসিয়া একখানা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিও কিছু পয়সা হইবে।

আমি একটি কথা আপনাদিগকে সবিনয়ে বলিয়া রাখিতে চাই যে আমি অতদূর যাইতে পারি নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় আপনাদের বেশী দূরে স্থিত নহে। অল্পদিন হইল আমি বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম, তাহারই একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আপনাদের সমীপে পেশ করিব বলিয়া আজ আমার এই সযত্ন প্রয়াস। দূরত্ব বেশী নহে বলিয়া আমার লজ্জিত হইবার কারণ নাই। আজকাল সাহিত্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বেশ আদর আছে বলিয়া মনে হয়। আমি বিলাত বা তিব্বত না গিয়া থাকিলেও ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কতকগুলি সাধারণ ঘটনা আমার এই সামান্য বর্দ্ধমান ভ্রমণেও ঘটিয়াছিল। যথা দৈনিক একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চা পান, বহুবার জল পান ইত্যাদি। একখানি ম্যাপ ও খানকয়েক ছবি দিয়া সাজাইয়া দিলে যে কোনও মাসিকপত্র

মুদ্রাদোষ

আমার এই বর্দ্ধমানভ্রমণকাহিনী যত্ন সহকারে গ্রহণ করিবে, এখন কেবলমাত্র গোটাকতক চটকদার ঘটনা জুটাইতে পারিলেই হইল। সম্প্রতি একখানি মাসিক পত্রে একজন মহিলা নরওয়ে ভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, জাহাজের প্রত্যেক রমণীই নিতান্ত পলিত গলিত না হইলে কাহারও না কাহারও সঙ্গে প্রেমসূত্রে বাঁধা পড়িতেছেন। একজন মহিলার লেখনী হইতে এমনতর চটকদার ঘটনা সম্বলিত ভ্রমণবৃত্তান্ত যে নিতান্ত মারাত্মক, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বর্দ্ধমান নরওয়ে হইতে কিছু নিকটে—আমার অসুবিধা ঠিক এইখানে। কিন্তু তাহাতে উপেক্ষার বিষয় কিছু নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি এই বর্দ্ধমান ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পুস্তকখানি যে এক সুরসাল ভ্রমণকাহিনী, তাহা হয় ত অনেকে জানেন না।

নরওয়েই হউক আর বর্দ্ধমানই হউক, ভ্রমণ ভ্রমণই। পৃথিবী অনন্ত শূন্যে নিরলসভাবে, অবিরত তীব্র বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের এই 'জগৎ' অর্থাৎ একান্ত গতিশীল Solar Express ক্রমাগত চলিয়া আজ কিছুক্ষণের

জন্ম আপনাদিগকে ১৩২২ সালের দ্বারদেশে নামাইয়া দিয়াছে। ইহার উপর আবার শারীরিক ভ্রমণ আছে, শুধু প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের কথা বলিতেছি না, অহোরাত্র আমরা হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেই ভালবাসি। এই হাওয়া খাওয়ার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর এত বেশী যে, কোনও কাজ করিতে গিয়াও আমরা হাওয়া খাইয়া বসি। ব্যবসা বাণিজ্য হাওয়া খাইতে গেলে চলে না; কাজেই সেদিকে আমরা বড় একটা ঘেঁসি না। সনাতন পাণের ডিপে, আর কাঁচিমার্কা সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ফেলিয়া আড়ংঘাটা হইতে ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির আফিসে Daily Passenger হিসাবে হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেই আমরা পটু।

তার পর আমাদের মস্তিষ্কও নিতান্ত বসিয়া থাকে না। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, আমরা নিয়ত ছুটিতেছি, আর্দ্দালীসহ বড় সাহেব ছুটিতেছেন, তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক বেচারীও খুব ছুটিতেছে। মস্তিষ্ক ঘুরাইতে পারি বলিয়া আমরা এখনও টিকিয়া আছি। তবে মাথাটা কিছু বেয়াড়ারকম ঘুরিয়া গেলেই যা বিপত্তি।

হৃদ্‌পিণ্ডটিও দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে, ঘড়ির

কাঁটার মত একস্থানে নিস্তব্ধ থাকিয়াও চলিতেছে। তিলমাত্র বিরাম নাই। এইরূপ চলিতে চলিতে যেদিন Terminusএ পৌঁছিবে, সেই দিনই চলার শেষ। যতদিন Terminus না মিলিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য সকলকে মালগাড়ীর মত Sidingএ ফেলিয়া 'আগে চল, আগে চল ভাই।'

এইখানেই ভ্রমণের শেষ নহে। হিন্দুরা বলেন অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে জীব মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই ভ্রমণবৃত্তান্তের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ হিন্দুদের দর্শন, তন্ত্র, ধর্ম্মনীতি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা সত্ত্বেও ইউরোপীয়েরা বলেন যে হিন্দুদিগের সভ্যতার মূল মন্ত্র স্থিতিশীলতা, গতিশীলতা নহে। এ কথা বলিলে আর গতি কি?

রেল ষ্টীমার বাইসিকেল না থাকিলেও সেকালে হিন্দুদের মনের গতি যে দ্রুত ছিল, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্বভাবতঃই মনের গতি অতি দ্রুত। কিন্তু উহা ত আমরা লক্ষ্য করি না। মনের গতি ঠিক ঘুঁড়ীর মত। নিদাঘের মধ্যাহ্নে রাখাল বালক একটি গাছের তলায় বসিয়া নিমীলিত নয়নে তাহার ঘুঁড়ীর সূত্রপ্রান্ত ধরিয়া

আছে।::আর তাহার ঘুড়ীখানি বাজিয়া বাজিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার মনে মুক্ত আকাশের সঙ্গে কত খেলাই খেলিতেছে। মনের এই ভ্রমণবৃত্তান্তই মানবজাতির ইতিহাস।

কথায় কথায় বর্দ্ধমান ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা হয় ত ব্যস্ত হইতেছেন, বর্দ্ধমানে কি দেখলাম কি শুনিলাম, তাহা অন্ততঃ এতক্ষণ আপনা-দিগকে বলা উচিত ছিল। বর্দ্ধমানে দেখিবার মত জিনিষ আছে—রাজপ্রাসাদ। সঙ্গীনের খোঁচার ভয়ে তাহা এযাত্রা দেখিতে বিরত হইয়াছি। সের আফ্‌গানের এক সমাধি আছে, সময়াভাবে সেদিকে যাইতে পারি নাই। কতকগুলি বড় দীঘি আছে, তাহার জল এমন কাল ও শীতল যে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। আর এক আছে গোলাপবাগ-- বর্দ্ধমানরাজের চিড়িয়াখানা ও সম্ভ্রান্ত অতিথিশালা। সম্ভ্রান্ত অতিথির সহিত চিড়িয়াখানার কি সম্বন্ধ আছে যেজন্য এতদুভয়ের একত্র অবস্থান ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহার গবেষণায়, এতাবৎকাল নিযুক্ত আছি।

গোলাপবাগ বেশী দূর দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে দুই বৃহৎ সর্প আমাদিগকে তাড়া

করিল। বন্ধুবর রাজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, "অশোক", "ধম্মপদ" প্রণেতা চারুচন্দ্র বসু ও আমি উৰ্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলাম। বৰ্দ্ধমানরাজের চিড়িয়াখানায় এই সাপগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া খেলা দেখান হইতেছে, এ রহস্যটা আমার মোটেই ভাল লাগিল না।

বৰ্দ্ধমান ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য আপনারা জানেন—অষ্টম সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিয়া সাহিত্যচর্চ্চার ও সীতাভোগ মিহিদানার সৎকারে স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন। সাহিত্যের সঙ্গে প্রকৃত রসের এবম্বিধ সুমধুর সম্মিলন এই অষ্টম অধিবেশনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য অনেক দর্শক ও প্রতিনিধি বৰ্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মিলনের বৈঠকে অধিক লোক সমাগম হয় নাই। মণ্ডপে পাছে স্থান সংকুলান না হয়, এজন্য সূক্ষ্মদর্শী মহারাজ প্রতিনিধির আবাস স্থলে প্রচুর খাদ্য ও পেয়ের বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। আমার বোধ হয় সেইগুলির প্রতি সুবিচার করিতে গিয়া অনেকে সম্মিলনের বৈঠকে আসিবার অবসর করিতে পারেন নাই। হয়ত পরবর্ত্তী সম্মিলনে চেষ্টা করিবেন।

বৰ্দ্ধমানের সম্মিলন মহাসম্মিলন নামে উল্লিখিত হইবার

যোগ্য। ইহার সভাপতি মহামহোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ, জনতাও এক মহাগুরুতর ব্যাপার। সম্মিলনের চারিটি শাখা ছিল—'চতুষ্কন্ধেব সা চমূ'। একটি শাখার অধিপতি ছিলেন অগ্রকার যিনি সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমিও অধিকাংশ সময়ে ইঁহার শাখায় বিচরণ করিয়াছি। কিন্তু যতই হউক, দর্শন শাখা তেমন জমে না। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব, ন্যায়ের ষোড়শ প্রমা, বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ম্, বের্গসনের ইনটুইশন, অয়কেনের আধ্যাত্মিকতা শুনিয়া শুনিয়া অরুচি ধরিয়া গেল। সাহিত্যশাখায় অনেক উপভোগ করিবার বিষয় ছিল। সাহিত্যে অন্ততঃ নয়টি রস আছে—ইচ্ছামত সেগুলিকে বাক্য জালে ফেলিয়া, ফেনাইয়া, ছানিয়া নিরানব্বইটি করিয়া লওয়া যায়। সাহিত্যবিভাগে সেই জন্য বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের মত আমোদের সঙ্গে অনেক উপদেশ ছিল। কেহ ঘুসি বাগাইয়া বীররসে বক্তৃতা করিতেছেন, কেহ বা নাকিসুরে করুণ রসের অবতারণা করিতেছেন, আর সভাপতির ঘণ্টা-ধ্বনি summary বিচারে অধিকাংশ বক্তৃতার অভিনন্দন করিতেছে।

সর্ব্বঘটে বিদ্যমান ব্যোমকেশ বাবু অন্যের রচিত কবিতা

পাঠকালে তাহার সঙ্গে যথেষ্ট মৌলিকতা মিশাইয়া দিতেছেন। কারণ অধিকাংশ স্থলে তিনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা কবিরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

ইতিহাস শাখায় বল্লাল সেনের দেবগ্রাম লইয়া সাত আটশত বৎসর পরে আবার যুদ্ধ ঘোষণা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ শাখার অধিনায়ক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার অতিকষ্টে শ্বেত পতাকা উড্ডীন করিয়া দিন কয়েকের মত Truce করিয়া দিয়াছেন।

বিজ্ঞানশালায় একটি ফল ফলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে—কাশিমবাজারের মহারাজ ভারতীয় পদ্ধতিতে জ্যোতিষের আলোচনা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন।

সম্মিলনে একটি বিষয় আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাই বলিয়া আমার এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করিব। সেও এক ভ্রমণবৃত্তান্ত। সম্মিলনে দেখিলাম সভাপতি ব্যতীত সকলেই ভ্রমণপরায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন শাখার সাহিত্যসেবিগণ ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া যুগপৎ সম্মিলনের কার্য্যের আগু-কৃত্য ও পরিপাক ক্রিয়ার সৌকর্য্য সাধন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে ভ্রমণের গতিকে সম্মিলনটি নিতান্ত জীবন্ত

হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে বক্তারা যেমন স্ব স্ব প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র, অপরদিকে শ্রোতৃগণও তেমনি ভ্রমণ করিতে পটু। আমিও যথারীতি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যখন আমার ডাক পড়িল, তখন রুমালে উপচক্ষু পরিমার্জ্জিত করিয়া নিতান্ত সকরুণ দৃষ্টিতে সেই চলিষ্ণু জনমণ্ডলীকে দেখিয়া লইলাম। প্রবন্ধ শুনাই কাহাকে? প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ শুনিয়া শুনিয়া সভাপতি ততক্ষণে উপনিষৎ তত্ত্বে সম্ভবতঃ মনোনিবেশ করিয়াছেন। দুই চারিজন বন্ধু কৃপা পরবশ হইয়া স্থাণুর ন্যায় আসন পরিগ্রহ করিয়া রহিলেন। অবশিষ্ট ভ্রমণশীল। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবন্ধ পাঠ সুরু করিয়া দেওয়া গেল। দর্শকগণ শ্রোতা নহে—আমাদের কক্ষে এক একবার একটু থামিয়া কক্ষান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেহ হাই তুলিয়া বক্তার প্রতি চাহিয়া বুঝাইয়া দিলেন জগৎ নশ্বর। কেহ কেহ বা গতিশীল অবস্থাতেই করতালিতে যোগদান করিয়া জানাইতে চাহিলেন যে কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই।

এই প্রকারে বক্তৃতা শেষ করিয়া আমি সেই ভ্রাম্যমান জনপুঞ্জকে আরও পরিভ্রমণের অবকাশ দিয়া সরিয়া পড়িলাম।'

সুবর্ণ মধ্যম

সুধীগণ শ্রবণ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে আমি ইংরাজী golden mean শব্দের তর্জ্জমা করিয়াছি "সুবর্ণ মধ্যম"। কথাটী একটু দুর্ব্বোধ হইল ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে বাছিয়া বাছিয়া দুর্ব্বোধ শব্দ ও অবোধ্য ভাষার ব্যবহার করা একেবারেই যে গৌড়-মাগধী-রীতি বিরুদ্ধ একথা কোনও ক্রমে বলা চলে না। "সুবর্ণ মধ্যম" কথাটী শুনিতেও কিছু মন্দ নয়। "সুবর্ণ সুযোগ", "সুবর্ণ যুগ" প্রভৃতি যখন প্রতিনিয়ত সাহিত্যের ভাণ্ডারে আমদানী হইয়া ভাষার সমৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে, তখন সুবর্ণ মধ্যমে আপত্তি থাকিতে পারে না। আগে অবশ্য এরূপ প্রয়োগ চলিত না। তাহার কারণ কতকটা বোধ হয় সেকালে কামিনী কাঞ্চনের উপর লোকের কিছু বিরাগ ছিল। এখন আমরা সুবর্ণের উপাসক হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং এস্থলে 'সুবর্ণ' পরিত্যাগ করিলে যে শুধু আর্থিক অর্থাৎ অর্থগত

লোকসান হইবে, তাহা নহে, অন্য প্রকারেও হানি হইবার সম্ভাবনা আছে। ইংরেজী "সুবর্ণ" শব্দের ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া, ভাষার বিশুদ্ধি রাখিয়া, বলিতে হইলে "উত্তম মধ্যম" দিতে হয়; কিন্তু তাহাতে আপনারাও হয়ত আমার প্রতি সেইরূপ কিছু ব্যবস্থা করিয়া বাসবেন, এমন আশঙ্কাও আছে।

"সুবর্ণ মধ্যম" একটি প্রাচীন কালের কথা, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। গ্রীকেরা এই প্রবাদের মূল্য বুঝিতে পারিয়া Delphiর মন্দির গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছিল—'বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়।' আবার একান্ত অভাবও ভাল নহে। এই দুয়ের মাঝামাঝি যে ব্যবস্থা, তাহাকে সুবর্ণ মধ্যম বলে। উপবাস করাও ভাল নহে, আবার বেশী আহারও আজকাল ব্যয়সাধ্য, সুতরাং মিতাহারই প্রশস্ত। লক্ষপতি ধনী হওয়া অসাধ্য, গরীব থাকাও কাজের কথা নহে; কিছু অর্থাগম হওয়া মন্দ নয়—ইহাই সুবর্ণ মধ্যমের মূল সূত্র। সুবর্ণ মধ্যম অপার সংসার সাগরে সোণার সেতু। মাঝামাঝি পথটা বেশ এবং অনেক স্থলে বেশ কাজে লাগিয়া যায়। একদিকে আত্যন্তিকতা

অপর দিকে অভাব, এই দুই "সিলা ও ক্যারিব্‌ডিজ"এর মাঝখান দিয়া তরণী বাহিয়া চলিয়া যাইতে পারিলে আর কথা থাকে না। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির ফেরে ঘোলার মধ্যে গিয়া ঘুরপাক খাইতে থাকি। মধ্য পন্থা খুঁজিতে গিয়া, আমরা পয়োনালার মধ্যে গড়াইয়া পড়ি।

আমরা সকলেই মাধ্যমিক। দর্শন শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ দর্শনে, যাঁহারা মধ্যপন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নাকি মাধ্যমিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল। সুবর্ণ মধ্যমের এত পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও আমাদিগকে যে মাধ্যমিক বলা হয় না, সেটা নিশ্চয়ই দার্শনিক-দিগের ব্যবসায়ে monopoly'র গতিকে।

আমাদের মাধ্যমিকতা আহারে, ব্যবহারে, সদরে, অন্দরে, সভাসমিতিতে সর্ব্বত্র অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছে। ধরুন আমরা চাই, শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক গড়িতে। সুবোধ বালক যাহা পায়, তাই খায়; যাহা পায় না, তাহা খায় না। ইহার মধ্যেও একটা স্পষ্ট মাধ্যমিকতা বিদ্যমান আছে। সুবোধ বালক শুধু আপন পাঠেতে মনোনিবেশ করে, সে জগতের কোনও খোঁজই রাখে না, যেন এ জগতের লোকই নয়, এমন অপোগণ্ড ভালমানুষ

সে। সে সাত চড়ে কথা কহে না, এমনই তাহার গুণ। লেখাপড়া শিখিয়া লোকে হাতাহাতি করিবে, এমন বর্ব্বরতা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। গোয়ার্ত্তুমি করাও দোষের, ভীরুর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ; দুয়ের মাঝামাঝি ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দেওয়াই বোধ হয় সুবর্ণ মধ্যম। ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে বা গাড়ীতে কেহ অপমান করিল ; উপায় কি ? স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ ; কিন্তু ষ্টেশন ছাড়িলে ট্রেন ফেল হয়। গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলে অস্থি পঞ্জর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সুতরাং প্রথমতঃ "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" এই মাধ্যমিক প্রণালী দেখিতে হইবে। তাহাতে ফলোদয় না হইলে, যথাসময়ে খবরের কাগজে তুমুল আন্দোলন করা যাইতে পারে।

সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতে হইলে বাগ্মিতা চাই ; তাহার দাবী রাখি না। এরূপ ক্ষেত্রে সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়া মাধ্যমিক নীতি ; তাহাতে নামটা কোন প্রকারে রেকর্ডে থাকিয়া যাওয়ার বাধা হয় না।

হ্যাট কোট টাই পরিলে নিতান্ত সাহেব বনিয়া যাইতে হয় ; আবার চটি চাদর নস্যও বেজায় সেকেলে ধরণের।

উভয়ের মাঝামাঝি হইতেছে গোল টুপী, গলাবন্ধ কোট, অথবা চাপকান বা আচকান, ও সামলা। ইহাতেও যাঁহাদের মন উঠে না, তাঁরা হ্যাটকোট পরেন বটে, কিন্তু মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অলক্ষ্যে গোটাকতক চুল বড় রাখিয়া দিয়া সনাতন ধর্ম্মের কতকটা মর্য্যাদা রক্ষা করেন, এমনও দেখিয়াছি।

গৃহলক্ষ্মীরাও বুট মোজায় অলক্তকরাগ ঢাকিয়া উচ্চ শিক্ষার মান রক্ষা করেন; খাদ্য ও অখাদ্য নানা সুস্বাদু দ্রব্যের দ্বারা পতি পরম গুরুর রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া শীতকালের রাত্রে এঁদো পুকুরের জলে অবগাহন স্নান পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করেন, ইহাও প্রত্যক্ষ ঘটনা।

ছাত্রদের মধ্যেও সুবর্ণ মধ্যমের পশার কম নহে। বই পড়িতে সময় লাগে ঢের

অনন্ত পারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্ব্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ—

এক্ষেত্রে তাঁহারা হংসের মত নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরটুকু—যাহা অধ্যাপকেরা নোটের আকারে পরিবেশন করেন,—সেই ক্ষীরটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন! বিশ্ব-

বিদ্যালয় রূপ গোষ্পদে পার হওয়ার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। একান্ত যদি তাহাতে না হয়, তবে যোগাড় একদফা ত পড়িয়াই আছে।

ছাত্রেরা নিজের কাজে অবহেলা করিলেও অপর সকলের কাজেই সর্ব্বদা সজাগ। নিজের কাজ ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত কাজই তাহাদের আপনার। বন্যার জন্য, কলেরার জন্য স্বেচ্ছাসেবক চাই—ছাত্রেরা আছে। দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তুলিতে হইবে—ছাত্রেরা আছে। গাড়ী ও ট্রাম হইতে হাতে পায়ে ধরিয়া লোক টানিয়া নামাইতে হইবে—ছাত্রেরা আছে। সভাসমিতির উদ্যোগ পর্ব্বেও ছাত্রেরা; আপনাদের এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। আর একটি কাজ আছে যাহাতে ছাত্রেরা আমাদের মধ্যম পন্থাকে অতীব বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলে। আমরা উচ্চকণ্ঠে স্বাদেশিকতার বক্তৃতা দিই, সকলকে মাতাইয়াও তুলি খুব, দেশ বিদেশের সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে আমাদের বিজয় পতাকা গৌরবে গর্ব্বে রঙীন হইয়া উড়ে; কিন্তু আমাদের মাধ্যমিকতার গুণে আইন বেশ বাঁচিয়া যায়। ধরা পড়ে যত ছাত্রেরা। বেচারীরা এখানে স্বর্ণ মধ্যমের নিয়ম মানিয়া চলিতে জানে না।

মুদ্রাদোষ

আমরা বক্তৃতা দেওয়ার সময় খাঁটি স্বদেশী ; আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্ট : কিন্তু চাল চলনে সাহেব। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, আমাদের বুলি বিলাতী, চালচলন বিলাতী, খানাপিনাও বিলাতী—কিন্তু তবুও স্বদেশী ভাবের প্রবীণ পুরোহিত আমরাই। আমাদের ড্রয়িংরুমে আসবাবের কারুকার্য্যে লুই দি ফোর্টিন্থের আমলের অনুকরণ আছে, সযত্ন বিন্যস্ত 'লনে'র পার্শ্বে শুভ্র ইটালিয়ান মার্বেলের নগ্নমূর্ত্তি আছে, দরজায় বেলজিয়মের কাচখণ্ডের ঝালর ঝুলিতেছে, সকালে সাঁঝে মেয়েরা পিয়ানো বাজাইয়া 'বেভানে'র বাড়ীর ছাপানো গৎ কস্ত করে এবং বাবুর্চ্চি খাঁটি ইংলিশ পোর্সি-লেনের বাসনে "উরষ্টার সসে"র সঙ্গে ফাউল কট্‌লেট্ পরিবেশন করে। অথচ গণেশের মত, দেশের গণতন্ত্রের পূজা আমরাই সর্ব্বাগ্রে পাই। কারণ আমরা বাক্যপটু খুব ।

বাঙ্গালীর শিক্ষা বাঙ্গালায় হইলে নেহাৎ খেলো হইয়া পড়ে ; সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁটিখানায় ইংরেজির মধ্য দিয়া distil (চোলাই) করিয়া লইয়া থাকি। সেই চোলাই করা বিদ্যার মাদকতায় আমরা ভরপূর। বিলাতী মালে যখন পেট ফাঁপিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই আমরা কিছু বুঝিতে পারিয়াছি বোধ হয়।

এই যে কমিশন, কম করিয়া ধরিলেও ষোল মাসে এক বিরাট 'দপ্তর' প্রসব করিল, দেখা যাক, কমিশনের কলমে কি রকম তরমিম ডিক্রী হয়। তবে মুস্কিল এই, সে রিপোর্ট পড়িবে কে? এ রিপোর্ট শুধু পাঠ করিবার জন্য Research Scholarshipএর ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা মজুরী পোষাইবে না। তার পরে এই কমিশন একটি সেরা রকমের স্বর্ণ মধ্যম। 'সম্মোহন' অস্ত্রের মত ইহাতে কাহারও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। অথচ সব দিক রক্ষা হয়। দো-দমা তুবড়ীর মত দুই একবার জ্বলিয়া, আপনি সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার-গিরি আপাততঃ আইন আদালতের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। জজ, ব্যারিষ্টার, উকীল এটর্ণী পাড়া ঘুরিয়া, শিক্ষাসুন্দরী বার্দ্ধক্যে এবার স্বাচিকিৎসকের শরণ লইয়াছেন। * মন্দ কি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ চিকিৎসা। তাহাতেও না কুলাইলে অগত্যা 'আলমা মেটারে'র গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গতিক দেখিয়া আমাদের বিদ্যার জাহাজ মহীশূরে পাড়ি

* বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্‌চ্যান্সেলার—ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার।

জমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। * আদিম কালের জাহাজের কাণ্ডারী আগেই সেখানে গিয়া নোঙর করিয়া বসিয়াছেন। † এখন মহীশূরী সূরিগণের ঝালের মুখে এত গরম মশলা ভাল লাগিলে হয়!

যাক্, পয়সা কিছু রোজগার করা আমাদের দরকার। ব্যবসা করিতে গেলে লোকসান খাইবার আশঙ্কা আছে। চাকরীই নিরাপদ। আমাদের শাস্ত্র নির্ঘাত বলিয়া দিয়াছেন "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।" সেই হইতে পুরুষানুক্রমে চাকরীই আমাদের প্রধান ভরসা; ব্যবসার মধ্যে বড় জোর ওকালতী। কিন্তু উকীল হইলেও সকলে চাকরীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই। তাই অনেকে ওকালতীর সঙ্গে এক বা ততোধিক প্রোফেসারি চাকরী জুটাইয়া লন। একদিকে ওকালতীর অগাধ পসার; অপর দিকে অনিশ্চয়তা। মধ্যপন্থায় শ'দুই টাকার বাধা হয় না। আজকালকার বাজারে ধনুকে একাধিক জ্যা থাকাটা মন্দ

* মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার—ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

† History of Ancient Indian Shipping--Dr. Radha-Kumud Mukherjee

নয়। উদাহরণ—আমার মত যাহারা মামুলী চাকর, তাহারাও কিছু কিছু ওকালতী ধরিতেছে। চাকরীর বাঁধা আয় যতই হউক, উপরি পাওনার কদর বেশী। সেই জন্য প্রোফেসারেরা উঠিয়া পড়িয়া স্থলবিশেষে ওকালতী জুড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা বেশ দুপয়সা উপরি সংস্থান করিয়া লইতেছেন। অর্থনীতিই হউক, আর প্রত্নতত্ত্বই হউক, হুবিস্কের লুপ্ত-পাঠ মুদ্রার প্রসঙ্গেই হউক, আর দনুজমর্দ্দন দেবের তাম্র-শাসনের প্রসঙ্গেই হউক, আমরা 'কৌশলে কুন্তলীনের কথা'র ন্যায় ওকালতীর আমদানী করিয়া বেশ পসার জমাইয়া লইতেছি।

আমার বোধ হয়, আমি নিজে সুবর্ণ মধ্যমের মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া ফেলিয়াছি, এর পরে হয়ত আপনারা আমার জন্য মধ্যম নারায়ণের ব্যবস্থা করিবেন। একেবারে কিছু না বলাও ভাল দেখাইত না; আবার বাহুল্যও বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আপনাদের দু'দণ্ডের হাসিবার ও ভাবিবার উপকরণ যোগাইয়া, আমি বিদায় লইতেছি। আপনাদের নববর্ষ সুখের, আনন্দের, মঙ্গলের নিদান হউক।

তাল ফেরতা

আমি হাসি মুখ দেখিতে বড় ভালবাসি। তাই আমার ক্ষীণ প্রচেষ্টা লইয়া সময়ে-সময়ে আপনাদের দ্বারে সন্ধ্যা প্রভাতে উপস্থিত হই। কিন্তু আমি জানি হাস্যরসের কড়ি-মধ্যম আদায় করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির পক্ষে কত কঠিন। আরও কঠিন এই জন্য যে, হাসিতে বলিলে লোকে হাসে না। এমনি সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে আপনারা কত হাসেন, কিন্তু যেমনই কেহ হাসাইবার জন্য একান্ত যত্ন দেখাইল, অমনই আপনারা গম্ভীর হইয়া বসিলেন—যেন শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শুনিতে বসিয়াছেন! লোকে হাসিতে কেন যে নারাজ, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সে-কালে ঠাকুরমা'রা নাকে কত কি গহনা পরিতেন, যাহার দুলুনিতে হাসির চকিত চমকটুকু অলক্ষিতে ঢাকিয়া যাইত। হাসিলে যে ধরা পড়িতে হয় তাহাই শুধু তাঁহারা জানিতেন; হাসির ফাঁদে যে সকলেই ধরা পড়ে, সেটুকু সে সতী-লক্ষ্মীরা বুঝি জানিতেন না। একালে অনেক শ্রোতা দেখিতে পাই,

হাসির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই চুরুট-বিরাজিত মুখে চট্ করিয়া আগুন লাগাইয়া বসেন। ঠাকুরমাদের গহনার মত, চুরুটের ধূমের পশ্চাতে তাঁহাদের অ-সামাল হাসিটি যাহাতে লুকাইয়া যায়, তাহারই জন্য আয়োজন। এমন কড়া-পাহারা-দেওয়া গৃহস্থের হাসির ভাণ্ডারে সিঁদ দিতে গিয়া যদি কখনও আমাকে শুধু উপহাসের ধূলি-পাংশু অঞ্চলে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, তবে যেন কেহ হাসিবেন না।

হাসি আমাদের সম্পদ্। জন্তুর মধ্যে শুধু মানুষই হাস্য-প্রবণ। অন্য কোনও জন্তু ইচ্ছা করিয়াই হাসে না, বা হাসিতে পারে না, তাহা আমি বলিতে পারি না। মানুষ হাসে। হাসিয়াই সে শ্রেষ্ঠ। আমরা অনেক সময় প্রতি-দ্বন্দ্বীকে শুধু হাসিয়াই উড়াইয়া দি। তর্কে যেখানে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা কঠিন, সে স্থলে কখন কখনও হাসিয়াই জিতিয়া যাওয়া যায়। আমরা ইতর জন্তুকে শুধু হাসিয়াই পশ্চাতে ফেলিয়াছি। ভাগ্যে বিধাতা হাসি দিয়াছিলেন! আমরা এ যাত্রা হাসিয়াই জিতিয়া গিয়াছি। প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ হাসিয়া; আমার মনে হয়, মানুষের মধ্যেও মানুষ শ্রেষ্ঠ হাসিয়া। হাস্য-রস সকল রসের সেরা। শিল্প-কলার স্বাধীন বিকাশ হাসিতে।

মুদ্রাদোষ

হাসি জীবনের আলো। হাসি ও অশ্রু জীবনের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ। চন্দ্রেরই কলার মত হাসি ক্ষয়শীল। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া হাসির জ্যোতিঃ যখন অশ্রুতে মিলাইয়া যায়, তখন জীবনে কোনও আলোই আর থাকে না। অশ্রু ও হাসি উভয়ে মিলিয়া সংসার-পটের এক অপূর্ব্ব প্রচ্ছন্ন ভূমি (Back-ground) রচনা করিয়াছে, আর তাহারই উপরে জীবনের তুলি বুলাইয়া আমরা নানা রঙ্গে করুণ-মধুর কত ছবি আঁকিয়া তুলিতেছি।

হাসি বড় চপল; ছোট ছেলের মত উদ্দাম; প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিয়া-ছুটিয়া বেড়াইতে সে ভালবাসে। হাসির বড় দিদি—কান্না—কিছু উদাস, গম্ভীর, স্থির, মন্থর। হাসিকে তাই সে মাঝে-মাঝে চোখ রাঙাইয়া শাসন করে। হাসিও তেমনই পাশ কাটাইয়া বাহিরে বাহিরে ফেরে। চোখের জলের অন্তরালে কখন কখনও রামধনু আঁকিয়া একটু আধটু মজা করিতেও সে ছাড়ে না।

হাসির শত্রু অনেক; সেই জন্য হাসিকে বড় সাবধানে চলিতে হয়। যেখানে সেখানে হাসা চলে না। কেহ কাজের কথা পাড়িয়াছে, কাহারও টাকার জন্য মাথায় মাথায় ভাবনা পড়িয়াছে, কেহ অসুখের যন্ত্রণায় অধীর

হইয়াছে, সেখানে যেন ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিও না। হাসির পরম শত্রু বেদনা (Emotion)। বেদনা শুধু দুঃখ নহে। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতিকে যদি সাধারণতঃ 'বেদনা' বলা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার বেদনাই হাসির শত্রু। মন যখন বেদনার মেঘাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, তখন কিছুতেই হাসির অরুণভাতি খেলে না।

হাসি বড় সুন্দর। সকল সৌন্দর্য্য হাসিতে খুলে। "ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে, মদন মূরছা পায়।" রূপের মর্ম্মরে হাসি মরকতের মীনা। উষার সীমন্তে বালার্কের মত, তরুণীর ললাটে টিপের মত, পাতার ঝাড়ে ফুলের মত সুন্দর মুখে হাসি বড় মানায়। হাসি সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য সঞ্চার করে, সুবর্ণের অলঙ্কারে হীরকদ্যুতি ফুটায়। তাই প্রেমের পূর্ব্বরাগ হাসিতেই বিকশিত হয়। মর্ম্মের কথা হাসিতে যেমন প্রকাশ করা যায়, এমন আর কিছুতে নহে। বসন্তের পিক-কাকলির ন্যায় হাসি সুসময়ের সূচনা করে। হাসির ভাষা আছে। চোখে-মুখে, কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনায়, অঙ্গের বিলাস-ভঙ্গীতে হাসি অবলীলায় তাহার মনের কথা বলিয়া ফেলে। "মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে।"

হাসি সরল প্রাণের স্বচ্ছ মুকুর। হাসি এক নিমেষে মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিয়া ফেলে। সংসারের নানা কর্ত্তব্য-কণ্টকিত কঠোরতার হস্ত হইতে একটু অবসর পাইলেই মানুষ মনের মানুষের আশ্রয় লয়,—যেখানে একটু হাল্কা হাসি হাসিয়া হৃদয়কে একেবারে খুলিয়া, মেলিয়া, বিলাইয়া দেওয়া চলে। হাসির স্ফূর্ত্তি স্বাধীনতায়। স্বাধীন ভাবে যেখানে মিশিতে পারা যায় না, সেখানে হাসি ফোটে না। বড়ই সখের জিনিষ হাসি। সখের বা স্বাধীনতার একটুও অভাব ঘটিলে হাসির চাঁদনী জোছনার অবাধ স্রোত বহে না। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে হাসিকে দন্তে দন্তে পিষিয়া শাসন করিতে হয়। কিন্তু একটু মুক্তি পাইলেই, সে হাসির ছলক পলকে সকল বাধা টুটাইয়া গিরিনির্ঝরের মত বহিয়া যায়।

মানুষের জীবনে দেবতার দান হাসি। জ্যোতিঃপ্রপাতের ন্যায় হাসির রজতধারাটী স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে। সুরসরিতের মতই তাহা রোগ, শোক, ব্যথা-কলুষিত মানবজীবনকে শান্ত, তরল প্রবাহে পূত করিয়া মুক্তিপ্রদান করে। আপনাদের হাসি জ্ঞানে ও অজ্ঞানে, সদরে ও অন্দরে, আধেয় ও আধারে অক্ষয় হউক।

তাল ফের্‌তা

হাসির বিমল প্রবাহটি বড় যত্নে রক্ষা করিতে হয়। অশ্রুজলের জমাট বাঁধা হিমনিকর উভয় কূল হইতে যে হাসির প্রবাহটিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিয়া আনিতেছে, তাহার হাত এড়াইব কিরূপে? তাই মনে হয়, হাসির সা-রি গ-ম প্রভৃতি যে কয়েকটি পর্দ্দা আছে, সবগুলিতে ঝঙ্কার দিয়া জীবনে একবার হাসির ঢেউ বহিয়া যাক্।

আত্ম-পরিচয়

নিজের কথা বলিতে সকলেই ভালবাসে, অথচ কেহ মুখ ফুটিয়া নিজের কথা বলিতে পারে না। নিজের কথা বলিতে গেলে কেন যে লোকের নাসাগ্র কুঞ্চিত হয় তাহা আমি মোটেই বুঝিতে পারি না। নিজের কথা বলা যত সহজ এমন আর কিছুই নয়; আর নিজের কথা যেমন ভাল লাগে, কই, এমন ত আর কিছু লাগে না। "বদন ছাড়িতে নাহি চায়।" যিনি বড় বড়াই করিয়া বলেন যে তিনি আত্মপ্রশংসা শুনিতে পারেন না, তাঁহার সে বড়াইটুকু সকল আত্মপ্রশংসা ছাড়াইয়া উঠে। আমি তা বলিয়া আত্মপ্রশংসার আরজি পেশ করিবার জন্য আপনাদের দরবারে উপস্থিত হই নাই। নিজের কথাই নিজে ভাল জানা যায়, কাজেই এই গুণিগণসমাজে অজানা বিষয়ের অবতারণা না করিয়া, দুটা নিজের সুখ দুঃখের কথাই যদি বলি, তবে সাঙ্গতিকেরা (ব্যাকরণ দোষ ঘটিল না ত?) —তবে সাঙ্গতিকেরা আমায় একটুকু প্রশ্রয় দিবেন কি?

আত্ম-পরিচয়

সভাসমিতির মামুলী নিয়মানুসারে সভাপতি বক্তার পরিচয় দিয়া থাকেন ; সঙ্গতে সে নিয়ম রক্ষিত হইতে দেখি নাই। সেই জন্য যদি বক্তা আত্মপরিচয় দিয়া নিজের জন্য একটু স্থান করিয়া লন, তাহা হইলে সেটা দণ্ডবিধির মধ্যে পড়িতে পারে না। অতএব এই বাসন্ত প্রদোষে, সঙ্গতের জমজমায়মান মজলিসে, বৃহৎ ভূমিকারূপ দোষ প্রশমন কামনায় সত্বর আত্মপরিচয় প্রদানে বিনিয়োগ করা যাক।

আমি আভাসে আত্মপরিচয় দিব, তত্ত্বজ্ঞ আপনারা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। আপনারা আমাকে জানেন, সুতরাং আত্মপরিচয়ের প্রয়োজন নাই ভাবিতেছেন ? না; আপনারা আমাকে জানেন না। বিশ্বময় খুঁজিলেও আপনারা আমার দেখা পাইবেন না। প্রহেলিকা নয়, সত্যই আমি বড় দুর্লভ সামগ্রী। আপনারা যাহাকে আমি বলিয়া মহাপ্রমাদে পড়িতেছেন, সে আমি নয়। আপনারা যদি জেদ করেন, শাস্ত্র আপনাদিগকে এখনি চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া দিবে। আমি এই শরীরটাকে নূতন নূতন কাপড়ের মত বদলাইয়া থাকি। এই দুর্মূল্যের দিনে, যখন কাপড়ের দাম ট্যাক্সিমীটারে ভাড়ার মত বাড়িয়া যাইতেছে, তখন সেটা কম সৌখীনতার কথা নহে। বস্ত্রের মত শরীরটাকে আবার

যে বস্ত্রের আবরণ পারাইতে হয়, সে কেবল কুসংস্কার। একদিন সভা করিয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি বস্ত্রকে বিদায় দেয়, তবে সঙ্গতের অধিবেশনে আর আলোর দরকার হইবে না। জলযোগকে নির্ব্বাসন করা হইয়াছে, আর একটা খরচও না হয় কমানো গেল!

আমার বাসস্থানের স্থিরতা নাই। আমি এই ধরাধামেই বাস করি বটে। কিন্তু শুধু আমি যে ভবঘুরে, তা নয়, আমার বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিশ্বঘুরে; বৎসরে একবার করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এক্স্‌প্রেসে চড়িয়া সূর্য্যটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। বাসগৃহের ত এই দুর্দ্দশা, সর্ব্বদাই ঘুরপাক খাইতেছে। মাথা রাখিবারও যায়গা নাই। সমস্ত মাথাটা ঘেরিয়া রহিয়াছে শূন্য, শুধু শূন্য। এই মহাশূন্যের মধ্যে প্রাণটা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। পৃথিবীটা ত ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝোলান আছে, তার উপর আবার যত শূন্যের বোঝা আসিয়া ঘাড়ে চাপে। ইহাতে যদি মাথাটা ঘুরিয়া যায়, তবে উত্তম অধম বা মধ্যম নারায়ণে কি করিবে?

আমার পিতৃপিতামহের পরিচয় দিয়া আপনাদের সময় অপহরণ করিতে চাহি না। লোকে বলে আমি অনাদি। সেটা অসম্ভব মনে হয় না। কারণ বয়সের ত গাছ পাথর

বড় দেখা যায় না। তার পর যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে আমি বরাবরই এমনি ছিলাম বলিয়া বোধ হয়। আমি ছিলাম না এমন একটা অবস্থা চক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আপনারাই বলুন না, কোনও দিন কোনও শনৈশ্চর লগ্নে, মঙ্গলের দশায় 'হঠাৎ বেগে দূতের প্রবেশ' গোছের আবির্ভাব আপনারা স্মরণ করিতে পারেন কি?

এইত গেল এদিককার কথা। আমার ব্যবসায় সম্বন্ধেও যথেষ্ট গোলযোগ রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, আমার একমাত্র পেশা সুখের পশ্চাতে ঘুরিয়া মরা। প্রজাপতির মত বিশ্বের ফুলবাগানে মধু সংগ্রহ করাই আমার কাজ। এ চাকরীটি কাহার অধীনে, কাহার সুপারিশে পাওয়া গেল, তাহা ঠিক জানি না। একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, চাকরীর সনন্দ উপস্থিত। সেদিন ভারি আনন্দের দিন গিয়াছে। সে দিন—আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন,—আমার জন্য আকাশ নির্ম্মল হইয়াছিল, মলয় বাতাস মৃদুমন্দ বহিয়াছিল, ফুলের সুবাস আকাশে, বাতাসে গ্রহ-নক্ষত্রে লুটিয়া লইয়াছিল, আর মাতৃস্তনে অজস্র ক্ষীরধারা ছুটিয়াছিল। সেই হইতে এই চাকরী করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের চাকরীর মত এ পাকা, কায়েমী

চাকরী। ইচ্ছা করিয়া রিজাইন না দিলে এ সুখের চাকরী যায় না। এ চাকরী ত্যাগ করিলে, তাও বলি—সংসারে আর মন তিষ্ঠে না। বনে যাইতে হয়। পঞ্চাশের পর—ফিফ্‌টিফাইভ্‌ নয়—পঞ্চাশের পর বনে যাইবার অর্থাৎ এ চাকরী হইতে রিটায়ার করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমরা ক্রমাগত এক্সটেন্সন লইয়া লইয়া, চাকরীর সুখ নিঙড়াইয়া বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভুক্তভোগীদিগকে প্রায়ই বলিতে শুনি যে, এ চাকরীতে আর লাভ নাই। ফুলের মধু আহারণ করিতে গিয়া কেবল লাভের মধ্যে কাঁটার খোঁচা খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। অনেকে বলে, সুখ মরীচিকা মাত্র, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে আপনাদিগকে প্রকৃত সংবাদ দিতে পারিলাম না। মরুভূমিযাত্রী কোনও ক্যারাভানের নিকট মরীচিকা সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যাইতে পারে। তবে সুখের লালসার তীব্র জ্বালায় হৃদয় যখন শুষ্ক, নীরস তপ্ত বালুরাশির মত হইয়া যায়, তখন মরুসঙ্গিনী মায়াবিনী মরীচিকা দেখা দিবে বিচিত্র নয়।

আমার জ্ঞানের দৌড় আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন; হয়ত ইতিমধ্যেই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে আমার মস্তিষ্কে কিছু গোল আছে। তা

হউক, আপনাদের নিকট যখন আত্মপরিচয় দিতে আসিয়াছি, তখন কিছুই গোপন করিব না। আমার এ আত্মচরিত স্বকপোল কল্পিত 'খাঁটি সত্য' নহে, যেহেতু আমি প্রতিভার দাবী করি না এবং সে প্রতিভা কোন কারখানায় কি ছাঁচে কেমন করিয়া প্রস্তুত হইল, তাহা দেখাইবার জন্য সার্দ্ধতিন মুদ্রা মূল্যের এক জীবন-চরিত ফাঁদিয়া বসিবার ইচ্ছাও নাই। সত্যকথা বলিতে গেলে, আমার জ্ঞান অতি অল্প। কিংবদন্তী মুরুব্বিয়ানা চালে বলে যে আমার জ্ঞান নই। প্রাচীনকালের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "আমি জানি যে, আমি কিছুই জানি না।" কিছুই জানি না, অথচ এত বড় কথাটি জানিয়া ফেলিয়াছি, এমন স্পর্দ্ধাও আমার নাই। যিনি জ্ঞানের বড় আড়তদার, তিনি ও কথা বলিতে পারেন,—লোকে বলিবে, কি বিনয়! বলা বাহুল্য এ পর্য্যন্ত কেহই সক্রেটিসের কথা বিশ্বাস করে নাই। আমার মত লোকে যদি বলে 'কিছুই জানি না', তখনই সকলে বলিবে লোকটা আর কিছু না হউক, সত্যবাদী বটে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চটি পায় দিয়া লাটপ্রাসাদে যাইতেন, শুনা যায়। কিন্তু আমি তদ্রূপ করিলে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়-যুগল যে অক্ষত রহিবে তাহা বলা যায় না। সুতরাং

জাহাজের খবরে আমার প্রয়োজন নাই। আমি সোজাসুজি এইটুকু বুঝি যে গর্ব্ব করিবার মত জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু তাহাতে আমার দোষ বেশী নাই—বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা আছে। কিন্তু অবস্থা প্রতিকূল বলিয়া সুবিধা করিতে পারি নাই। যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা স্পর্শ করি, সবই আবছায়া। সবই ভাসা ভাসা জ্ঞান। জিনিষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার মর্ম্ম জানিবার কৌতূহল আছে, কিন্তু শক্তি নাই, সুবিধা নাই। বাহিরের জগৎ ত দূরের কথা, নিজেকেও একটু ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ এতদিনে করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভিতরে যে মনটা আছে, তাহাকে ত একমুহূর্ত্তও বাড়ীতে পাই না। সে যে দুষ্ট ছেলের মত সারাদিন কোথায় বনবাদাড়ে পাখীর ছানা পাড়িয়া, ফল কুড়াইয়া বেড়ায়, এবং কখন্ সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীতে চুপি চুপি আসিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা বুঝিতে পারি না। তাহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া ভার। মনটা ভুলিয়া কাহাকেও দিয়া ফেলিয়াছি বা কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এমনও সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। বাল্যকাল হইতে মন লইয়া এমনি করিয়া বিব্রত থাকিতে হইয়াছে।

তার পরে এই দেহটা। এও কি ছাই ভাল করিয়া

ধরা দেয়। অর্দ্ধেকটা ত পিছন ফিরিয়াই আছে। সেদিকটা সারাজীবন অজানাই রহিয়া গেল! ট্রামের টিকিটের 'পশ্চাদ্‌ভাগ' দেখিয়াই জীবন কাটিল, নিজের পশ্চাদ্‌ভাগ দেখিবার অবকাশ ঘটিল না। অধিক কি, যে চক্ষু দ্বারা সকল জিনিষ দেখিবার আশা করি, সে চক্ষু নিজকে দেখিতে পায় না, এমনই অন্ধ! আমার চেহারাটা বোধ হয় নেহাৎ মন্দ না। কিন্তু আমাদের দেশের গবেষণাকারিগণ যেমন নিজের দেশের ও জাতির কথা জানিবার জন্য ঝুলিহস্তে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত ধার করিতে বাহির হন, তেমনি আমার নিজের চেহারা সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাকে পরের শরণাগত হইতে হয়। নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাই না। আপনারা দেখিয়া যদি বলেন, বাঃ বেশ, মন্দ নয়, তখন একটু হুঁস হয়। প্রতিবিম্ব দেখিয়া কদাচিৎ কখনও একটু আধটু আনন্দ লাভ করা যায় বটে। ইচ্ছা করে যখন কোনও কাজ না থাকে, তখন নিজের মুখখানা ভাল করিয়া দেখি। কম দেখা যায় বলিয়াই হউক, আর যার চেহারা তার কাছে খারাপ হইলেও মন্দ লাগে না বলিয়াই হউক, আমার মুখ দেখিতে আমার কেন, সকলেরই সখ আছে, দেখিয়া যেন সাধ মিটে না। "নয়ন না তিরপিত

ভেল।” কিন্তু বেশীক্ষণ সে দ্রব্যটি উপভোগ করিতে হইলে, লোকালয় ছাড়িয়া বিজন অরণ্যে বা বিরল গৃহকোণে যাইতে হয়। ভয় হয়, পাছে কেহ দেখে। সমাজের এমনই দুরবস্থা যে, মুখখানা যে ভাল করিয়া দুদণ্ড দেখিয়া লইব, সে যো নাই। নিজের সহিত পরিচয় লাভ করিবার এত বড় অন্তরায়, ঘোর অবিচার নহে কি? আবার তাও বলি, যদি বিধাতা চক্ষুটাকে আঙ্গুলের ডগায় বসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে, আঙ্গুলগুলি আজ কাল গোঁফে তা দিতে যেমন সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকে, তেমনি হয়ত দিবারাত্র মুখ দেখিয়া বিব্রত থাকিত—সংসার যাত্রা অচল হইয়া পড়িত। মুখ দেখিয়া অনেকের চোখ ফেরে না। ফোটোগ্রাফ তুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও মন উঠে না। বস্তুতঃ সত্যকার জীবনে এমন একটা গতি বা চলিষ্ণু ভাব আছে, যাহা তোমার ঐ ক্যামেরা আড় করিয়া ধরিলেই চম্পট দেয়, এবং তার পরে যে ছবি উঠে, সে রামা শ্যামা হরে'র হইলেও হইতে পারে, আমার নয়। একবার আমি ও আমার বন্ধুবর সুরেশ সমাজপতি মহাশয় একত্র ছবি তুলিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় সে দোকানে আর একটি ভদ্র-লোক তাঁহার ছবি 'ডিলিভারি' লইতে আসিয়াছিলেন।

ফিতা খুলিয়া যখন তিনি ছবি বাহির করিয়া দেখিলেন, তখন তিনি ত চটিয়া লাল! তিনি বলিলেন, "এ ছবি ভাল হয় নাই, এ আমি লইব না।" তখন একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী চশমাযোড়া নাকের ডগায় নামাইয়া, দুই একবার তীব্র কটাক্ষে সেই বাবুটির দিকে, এবং দুই একবার ছবির দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে ছবিগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কেন মশায়, কি দোষ হয়েছে?"

বাবু তখনও বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এ ছবি কিছুই হয় নাই। অতি বিশ্রী হয়েছে।"

বৃদ্ধ কর্ম্মচারী একটু বিরক্তির সহিত হাসিয়া বলিলেন, "আবার কি হবে? যেমন চেহারা তেমনই ত হবে।"

বাবুটি বুঝিলেন, তাঁহার চেহারার তারিফ করা হইতেছে না। বেগতিক দেখিয়া তিনি টাকা কয়েকটি গণিয়া দিয়া ছবি লইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে সরিয়া পড়িলেন। আমার বোধ হয়, সব ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। আয়নায় দেখিয়া বা ফটো হইতে নিজের যেটুকু জানিতে পারা যায়, সে কেবল বিম্বজ্ঞান। সে ছায়ার উপর নির্ভর করিলে সেই মাংস-লোলুপ কুকুরের অবস্থা পাইতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন আয়নায় চেহারা ভিন্ন ভিন্ন দেখায়; ভিন্ন ভিন্ন ফটোতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে চেনে সে কোনও মতে চিনিতে পারে; আর যে চেনে না, তাহাকে বোঝান ভার।

এই সকল নানা কারণে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডারে দারিদ্র্য ঢুকিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আমি এইটুকু সার বুঝিয়াছি যে, জানিবার বড় কিছুই নাই। কিছুই যখন ঠিক মত জানা যায় না, সবই যখন অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য, তখন আমার আর ক্ষোভের কারণ কি? আলস্য-পরতন্ত্র বালক সময়ে সময়ে মনে করে যে এম এ বি এ পাস করিয়াও যখন চাকরী পাওয়া যায় না, তখন আর পড়াশুনায় দরকার কি? আমিও সেই প্রকার সান্ত্বনা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি।

জ্ঞানের অনুপাতেই শক্তি—আজকালকার শাস্ত্রে তাই বলে knowledge is power. আমার জ্ঞান যখন অল্প তখন শক্তি-সামর্থ্যও যে তদ্রূপ তাহা বলা বাহুল্য। এমনই অসহায় আমি, যে এক মুহূর্ত্তও ধরা হইতে আপনাকে বিচ্যুত করিতে পারি না। শিকল-বাঁধা পাখী যেমন দাঁড় হইতে উড়িয়া উড়িয়া দাঁড়ের উপরেই শেষে আছাড় খাইয়া পড়ে, তেমনই আমার অবস্থা। কল্পনা চলে আকাশে,

পা রহে মাটিতে। কাজেই অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। স্বর্গের চিন্তা মনের পটে উজ্জ্বল রঙ ফলাইয়া ছবি আঁকিতে বসে, দেহটা তখন ধূলামাটির মধ্যে গড়াগড়ি খাইয়া খাইয়া ভূত হইয়া উঠে! অক্ষমত্ব আর কাহাকে বলে? দেবতারা একক এবং সকলে মিলিয়াও নাকি একগাছি তৃণ উড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং আমার লজ্জার কারণ নাই। তবে যখন দেখি যে, আমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার নিজের ছায়াটি পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না, তখন মনটা ভারি দমিয়া যায়।

এইবার আমার আর্থিক অবস্থার পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। আমি না বলিলেও আপনারা আমার গতিক দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নহে। আমার অর্থ নাই, অথচ আমি অর্থী। আর, অর্থের প্রয়োজনই বা কি? আজকাল অর্থ দিলেও জিনিষ পাওয়া যায় না। অর্থের মূল্য দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। হয়ত এমন দিন আসিবে যে অর্থের আর কোনও মূল্যই থাকিবে না। হেমন্তে ঝরা পাতার মত অর্থ হয়ত পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবে, আর আমরা হেলায় তাহা লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া যাইব। তবে আমি

ইহা কোন মতেই স্বীকার করিব না যে অর্থ অনর্থের মূল। অর্থের মূল অর্থ, অনর্থের মূল অনর্থ। তিল হইতেই তৈল জন্মে, জল হইতে নহে। শঙ্কর এতবড় নৈয়ায়িক হইয়াও এই সামান্য (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) বিরোধ বিধিটা অমান্য করিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সৎ ও অসৎ (Being and non Being) এক হয় হউক, তাহাও সহ্য করা যায়, কিন্তু এমন ঘরকন্নার জিনিষ অর্থ যে চট্ করিয়া অনর্থ হইয়া দাড়াইবে, ইহা অসহনীয়। শঙ্করাচার্য্য চিরকাল রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়াই গেলেন।

এতক্ষণে আমার পরিচয় পাইলেন কি? যদি না-ও পাইয়া থাকেন, দু'দণ্ড ত একরকমে কাটিয়া গেল বটে।

আমার সেতার শিক্ষা

সে আজ অনেক দিনের কথা। দিন চলিয়া যায়, কিন্তু গোধূলির সুবর্ণচ্ছটা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দিনান্তের আকাশ আলো করিয়া থাকে। আমারও মনে সে দিনের স্মৃতি এখনও স্নিগ্ধ তরল মধুরিমায় কমনীয় হইয়া রহিয়াছে।

তখন আমি বি-এ পড়ি। পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীর পশ্চাতে আমাদের মেস্ ছিল। গলি দিয়া প্রবেশ করিতে হইত। মেসের বাড়ী প্রায়ই যেমন হয়—একটু আলো, একটু আঁধার, একটু খট্‌খটে, একটু সেঁতসেঁতে সেই রকমের বাড়ী। আমরা দ্বিতলে থাকিতাম। "আমাদের" একটু পরিচয় দিয়া রাখি। নেপাল বাবু ব্রাহ্ম, চস্‌মা মণ্ডিত, সদা প্রফুল্ল স্কুলমাষ্টার। কুঞ্জ বাবু ব্রাহ্মভাবাপন্ন, উদার ব্যয়শীল ছাত্র। তিনি আমাদের উপরে পড়িতেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার পাঠের বিঘ্ন ঘটায় তখনও তিনি গ্র্যাজুয়েট হইবার আর-একটা চ্যান্স ট্রাই করিতেছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহাকে মুরুব্বির মত মান্য করিতাম। মেসের

ব্যবস্থা, ম্যানেজারি প্রভৃতির ভার তাঁহারই স্কন্ধে পড়িত। 'নারায়ণ' বেচারী মারা গিয়াছে, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। নারায়ণ শেষে বরিশালে এবং কলিকাতার কলেজে অধ্যাপকতা করিয়াছিল। রাসবিহারী লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু মেজাজ গরম হইলে রক্ষা থাকিত না। আমার মনে আছে, একদিন নারায়ণের উপর চটিয়া গিয়া রাসবিহারী যখন তাহাকে "Chimpanzee," "bulky fellow" প্রভৃতি নানাবিধ মৌলিকতাপূর্ণ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন, তখন মেসের ছেলেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্র একটু বেশী রকমের ভালমানুষ ছিল, সেই জন্য, যেমন হয়, অন্য ছেলেরা তাহাকে লইয়া মাঝে মাঝে একটু রহস্য করিতে ছাড়িত না। মহেন্দ্র যে তাহাতে মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হেম অতি শান্ত শিষ্ট ধরণের ছেলে ছিল, কিন্তু বুদ্ধির কিছু প্রাখর্য্য থাকায়, তাহাকে নিরীহ ভাল মানুষ বলিয়া কেহ উপেক্ষা করিতে পারিত না। হেম পরে বিলাতে গিয়া কৌঁসুলী হইয়া আসিয়াছে। যতি মেসে থাকিত বটে, কিন্তু পদ্মপত্রের জলের মত নির্লিপ্তভাবে থাকিত। মেসের জীবনের সহিত সে যে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিত, তাহা

আমার মোটেই বোধ হইত না। যতির কণ্ঠস্বর এখন যেমন আছে, তাহা অপেক্ষাও মিষ্ট ছিল! "মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে" আরও অপূর্ব্ব মধুরতায় আমাদিগকে মোহিত করিত। তবে কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি তখনও স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই; এ সকল পর-জীবনে আমদানী হইয়াছে। অনাদিনাথ ছিল আমাদের মধ্যে রসিক ভাবসাগর। তাহার সঙ্গীতের গলা ছিল না; কিন্তু প্রতিভাগুণে সে কালোয়াতী হইতে কথকতা পর্য্যন্ত, কীর্ত্তন হইতে কবির তর্জ্জা পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে আমাদের শুনাইয়া যাইত। ষ্টীফেন সাহেবের লেক্‌চার, হেক্‌টর সাহেবের অঙ্গভঙ্গী আমরা মেসের কক্ষে বসিয়াই উপভোগ করিতে পারিতাম। অনাদিনাথের গান

এস হে এস পিয়ন সখা, ঐরূপে দেও দেখা
তোমার পায়েতে নাগরায় জুতা হে,—
তায় আগাগোড়া কাদামাখা
ঐ রূপে দেও দেখা।
তোমার গলে দোলে চামড়ার ব্যাগ হে,
তায় ঝম্ ঝম্ কেবল বাজে টাকা
ঐ রূপে দেও দেখা।

আমরা কত বর্ষার দিনে মুড়ি মটর ভাজার সঙ্গে উপভোগ করিয়াছি। অনাদিনাথের এই গান সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের "প্রতিশোধ" গল্পে স্থান পাইয়াছে। ইঁহারই নিকট হইতে যতীন্দ্রনাথ অনেক রস-সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিল। যতি সে সময়েও অনেক বড় আসরে গান গাহিত। সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমরা দুজনে গান গাহিয়াছিলাম—সে আজ প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে। মেসে অনেক সময় যতির সঙ্গীতে আমাদের মন পুলকাকুল হইয়া উঠিত; পাশের বাড়ীতে অনেকে আসিয়া সে সঙ্গীতের মোহে দু'ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া গিয়াছেন এমনও আমরা শুনিয়াছি। যতি গাহিত

কেন আর গাঁথলো মালা, মালা গেঁথনা মালিনী
তোরে হতে হ'বে পাগলিনী
এ মালা তোর জপমালা হবে লো রাই রাজনন্দিনী।

অনাদিনাথ গানের গমক কোথায় কোথায় হইবে, তাহা অতি বাস্তব ভাবে অঙ্গভঙ্গী-সহকারে দেখাইয়া দিত। অনাদিনাথ ত গাহিতে জানিত না, কাজেই ভাব ভঙ্গীর দ্বারা বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইত! যতি ও অনাদিনাথের সঙ্গে, আমিও সুর মিলাইতাম। জয়দেবের পদাবলী আমার খুব

ভাল লাগিত। কিন্তু মুখস্থ করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইত না; সুতরাং বাঙ্গালা পদাবলী রচনা করিয়া লওয়া গেল :—

মঞ্জু কুঞ্জবনে, কুঞ্জ বিনোদনে, অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি
চমকিছে চুম্বন পুলকে আলিঙ্গন মধুমুখে মৃদুহাস মাখি।
ইত্যাদি

যতি আর হেম এক ঘরে থাকিত। আমারও অধিকাংশ সময় সেই ঘরেই কাটিত। আমি সবচেয়ে তাহাদিগকে বেশী ভালবাসিতাম। বাল্যকাল হইতেই আমি তাহাদের সহপাঠী ছিলাম। কলিকাতার একটি স্কুল হইতে ডবল প্রোমোশন লইয়া নড়ালে গিয়া যখন ভর্ত্তি হইলাম, তখন যতির সেই প্রথম সম্ভাষণ "সোণার চান্‌ছ্লে" (অর্থাৎ সোণার চাঁদ ছেলে) আজও আমার মনে আছে। তখন মনে মনে ভারি চটিয়া গিয়াছিলাম; তখন কি জানি যে, পর-জীবনে যতি আমার জীবনের এত বড় একটা অংশ ব্যাপিয়া থাকিবে কলিকাতার মেসে ছেলেরা পড়াশুনা অপেক্ষা আড্ডা দেওয়ার বিদ্যাটা বেশী করিয়া শিখিয়া থাকে। মেসে আসিবার পূর্ব্বে আড্ডা দিবার জন্য সাজসজ্জা করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে হয়; আর মেসে এক স্থানেই সব মিলে; সুতরাং আড্ডাটা

চট্ করিয়া জমিয়া যায়। আমাদেরও বেশ জমিয়া গিয়াছিল। তবে যতি প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিত। আমরা মনে করিতাম যে, বোধ হয় সে একটা ভাল বিবাহের সন্ধানে ঘুরিতেছে। যতি আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা করিবে না ত? সে পক্ষে যতির নানা :সুবিধাও ছিল, যতির চেহারাও সুন্দর, সঙ্গীতে সে মন ভুলাইতে পারিত, চিত্রাঙ্কনে সুপটু। এত গুণ কি পড়িতে পায়? আমাদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সে "লাকি ডগ্" [বাঙ্গালায় বলিলে পাছে কেহ তিরস্কার মনে করেন!] সত্য সত্যই তাহার গুণের পুরস্কার বা তদপেক্ষাও অনেক বেশী লাভ করিয়াছিল।

মেসের দৈনন্দিন জীবন যেমন কাটে, আমাদেরও জীবন তেমনই কাটিত। আড্ডা, তর্ক, কোলাহলেই আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। কিছু কিছু পড়া যে না হইত এমন নহে। যতি পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন আর যাবতীয় পুস্তকের গুণগ্রাহী পাঠক ছিল। আমি চেষ্টা করিতাম, পাঠ্যপুস্তকে তাহার প্রবৃত্তি লওয়াইতে; সে তাহার উত্তরে ছবি আঁকিতে বসিত। দেওয়ালের গায়ে Trilb\ র * পা

---

* Trilby Ry george Du maurier

এত সুন্দরভাবে আঁকিয়াছিল, যে সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিতেন। যতি চেষ্টা করিত, "সাহিত্যের" জন্য আমাকে প্রবন্ধ লেখাইতে। তাহার কথা আমি রক্ষা করিয়াছিলাম। সে কিন্তু আমার কথা রাখে নাই।

মেসের আহার যেমন হইয়া থাকে, থোড়বড়ি খাড়া, আমাদেরও তাহাই হইত। আমাদের এক বর্ষীয়সী বামুন ঠাক্‌রুণ ছিল, সে যাহা মাপিত, তাহাই আমরা পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিতাম। তাহার মাছের ঝোলে বিরল মৎস্য খণ্ড সাঁতার খেলিত। এই মাছের ঝোলও সে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতে কুণ্ঠিত ছিল; বলিত, "বাবা, ডাল যত চাও দিতে পারি, মাছের ঝোল তোমাদের সব দিলে, আর ছেলে-দের দিব কি?" একদিন অনাদিনাথ একলা সমস্ত ডাল খাইয়া ফেলিয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দিল। যতি তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত। অনাদিনাথের সে পুত্রবধূ ছিল। শ্বশুর ও ছেলেকে সে যথেষ্ট খাতির করিত। আমাদেরও সে যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিত। তবে সে সবচেয়ে বেশী ভাল বাসিত—কুঞ্জ বাবুকে। কিছু বকশিশ্‌ সে যে আদায় করিত না, এমন:নহে। কুঞ্জ বাবুকে সে বাছিয়া বাছিয়া মাছ মাংস দিতে ভুলিত না; নেপাল বাবু মাংসের ঝোলে শুধু

আলু পাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিলে, বামুন ঠাকুরুণ অতি স্নেহের স্বরে বলিয়াছিল, "আলু যে তুমি ভালবাস।" আমাদের কাহারও অসুখ হইলে সে ব্রাহ্মণকন্যার উদ্বেগের অবধি থাকিত না। কাহারও টাকা আসিতে বিলম্ব হইলে, সে টাকা দিয়া সাহায্য করিত। একবার আমার পরীক্ষার ফী সংগ্রহ হইয়া উঠিল না। সেবার কলিকাতায় দুরন্ত বর্ষা; রাস্তায় তিন চারদিন পর্য্যন্ত স্রোত বহিয়াছিল। বামুন ঠাকরুণ আমাকে বাড়ী হইতে ফিয়ের টাকা না আনিয়া দিলে অন্য কোথাও গিয়া টাকা যোগাড় করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। বামুন ঠাকুরুণ মারা গিয়াছে, কিন্তু আজিও তাহার কথা মনে হইলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়।

শনি রবিবারে মেসের ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ থিয়েটার দেখিতে ছুটিত। সকলেই যে যাইত এমন নহে। কাহারও কাহারও মতে থিয়েটার যাওয়া নীতিবিরুদ্ধ ছিল। কুঞ্জ বাবু, নেপাল বাবু, আমি—এই শেষোক্ত দলের ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় হেম, যতি, মহেন্দ্র, নারায়ণ প্রভৃতি সকলে জুটিয়া থিয়েটারে গেল। আমাদেরও টানিয়াছিল, কিন্তু আমরা রাজি হইতে পারি নাই, তাই আহারের পর আমরা জন কয়েক মিলিয়া আড্ডা দিতেছিলাম। কিছু

দিন পূর্ব্বে যতি একটি সেতার কিনিয়া আনিয়াছিল, আমি সেই সেতারটি লইয়া, সুর বাঁধিয়া বাজাইতে বসিয়া গিয়াছি, আর আমার শ্রোতৃগণ মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শুনিতেছেন। আমি যে ভাল বাজাইতে পারিতাম, তাহা নহে; আমি কখনও কাহারও নিকট শিখি নাই। অপরকে বাজাইতে শুনিয়া, তাহার ছায়া যেটুকু ধরিতে পারিতাম, ততদূরই আমার বিদ্যা।

আমি বাজাইতেছি, এমন সময় রাসবিহারী আসিয়া খবর দিল, "নীচে একজন ভদ্রলোক এসে আপনাদের সেতারসহ ডেকেছেন।" আমরা গর্জ্জিয়া উঠিলাম, "প্রয়োজন হয়, তিনি আমাদের নিকট আসতে পারেন।"

রাসবিহারী বলিল, "তা নয়, সে ব্যক্তি বাতে পীড়িত। উপরে উঠে আসতে পারেন না, তাই বলছেন যে, যদি আপনারা অনুগ্রহ করে নীচে যান।"

সকলেই "তা বটে, তাই বল" ইত্যাদি অভিমত প্রকাশ করিয়া নীচে চলিলেন। সেতারও লওয়া হইল। আমি না কি ওস্তাদ; সুতরাং সেতারটি কোনও সাগরেদের স্কন্ধে বাহিত হইল। নীচে নামিয়া দেখিলাম, পণ্ডিত তারাকুমারের বৈঠকখানায় এক ভদ্রলোক তক্তপোষের উপর

বসিয়া আছেন। তিনি অনেক বিনয় সম্ভাষণে আমাদিগকে তুষ্ট করিলেন এবং বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে কে বাজাইতেছিলেন, যদি একবার বাজান!"

আমার সাগ্‌রেতেরা তৎক্ষণাৎ আমার দিকে সেতার লম্বিত করিয়া দিলেন। আমি কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে আগন্তুক একজন গুণী ব্যক্তি; আমি বলিলাম, "আপনিই বাজান, আমরা শুনি।"

তিনি বলিলেন, "আমি পরে বাজাইব; আগে আপনাদের একখানা হোক।" আমার প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল; বাজাইতে বাধ্য হইলাম। বোধ হয় জয়জয়ন্তী কি এমনই কিছু একটা বাজাইয়াছিলাম। বাজনা শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন; "আমি পথে যেতে যেতে সেতার শুনে ভেবেছিলাম যে আপনি বুঝি ভাল বাজাইতে পারেন! তবে আপনি সুর বেঁধেছেন খুব ভাল, আপনার সঙ্গীতের কাণ আছে!" আর কাণ আছে! আমি সাগ্‌রেৎদিগের মাঝখানে ভারি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম।

তিনি অনেকক্ষণ বাজাইলেন। অতি সুন্দর হাত; সচরাচর সেরূপ সেতার বাজনা শুনা যায় না। তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি যদি সেতার শিখতে ইচ্ছে

করেন ; তবে আমার বাড়ীতে এই সেতারটি নিয়ে আসতে পারেন। আপনার যেরূপ সঙ্গীতের taste আছে ; তাতে ছ' মাসের মধ্যে আপনাকে এমন শিখিয়ে দেব যে, আপনি সকলের সমক্ষে বাজাতে পারবেন! আমার বাড়ী বেশী দূর নয়, এই গলির মোড়েই সাদা বাড়ী। আপনি কি পড়েন?'

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আমার একজন বন্ধু বলিলেন, "উনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়েন।"

তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "দেখুন, তবে আমি আপনাকে জিদ্ করব না। আপনার যদি নিতান্ত ইচ্ছে হয় ত আসতে পারেন।"

তিনি সকলের অজস্র প্রশংসাবাদের মধ্যে বিদায় লইলেন। আমরাও শয়ন করিতে গেলাম। আমার ঘুম হইল না। ছেলেবেলা হইতে সঙ্গীতের প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ ছিল। যত বুঝি আর না বুঝি, সঙ্গীতের সম্মোহন প্রভাব জীবনের প্রত্যেক অণুতে অনুভব করিবার শক্তি ভগবান দিয়েছিলেন। আমার বয়স যখন বার বৎসর, তখন আমি গান গাহিতাম, সেতার এসরাজ বাঁয়া তবলা খোল পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতাম। কিন্তু কোনটাই ভাল পারিতাম না। তাহার কারণ আমি কখনও ইহার

কিছুই রীতিমত শিখি নাই, শিখিবার সুযোগ হয় নাই। আজ বিধাতা এক অপূর্ব্ব সুযোগ আমার দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। বীণাপাণি তাঁহার প্রিয় যন্ত্রটি আমার হাতে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আমি অনায়াসে ছ'মাসের মধ্যে বাজনা শিখিয়া সাধারণে বাজাইতে পারিব, আশা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি সকল শরীরে উৎসাহের এমন অপূর্ব্ব উন্মাদনা অনুভব করিলাম যে, জীবনে তেমন বোধ হয় আর কদাচিৎ ঘটিয়াছে।

ঘুম হইল না। রাত্রি যখন ৩টা, তখন থিয়েটারের যাত্রীরা আসিয়া গলির দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। তাহার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাদের কলরব শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমি সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া দিতে গেলাম। থিয়েটার যাত্রীরা এক একবার সমবেত ভাবে দরজায় আঘাত করিতেছেন, আবার তখনই থিয়েটারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। কে ভাল নাচিয়াছিল, কে কোন স্থল ভাল অভিনয় করিয়াছিল, কোন্ গানটি সবচেয়ে ভাল হইয়াছিল—তাহাই অভিজ্ঞের মত ব্যক্ত করিতে সকলে ব্যস্ত। আমি সেই অবসরে দরজার খিল খুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলাম। পরমুহূর্ত্তে ধাক্কা

দিতে গিয়া যখন দরজা খুলিয়া গেল, তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। বিস্মিত হইল না সে — মহেন্দ্র, আর নারাণ। তাহারাই প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং আমার পলায়নপর মূর্ত্তি একবার মাত্র চকিতে দেখিতে পাইয়াছিল। তখন অস্তমিত জ্যোৎস্না মলিন হইয়া আসিয়াছিল। আমার থান কাপড় খানিও শুভ্র ছিল। সেই স্তিমিত জোৎস্নায় আপাদমস্তক শুভ্র বসনে মণ্ডিত মূর্ত্তি তাহাদের সম্মুখে যখন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন তাহাদের বুক যে ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নারাণ মনস্তত্ত্বের ছাত্র ছিল, সে ঘটনাটাকে মায়া বা মতিবিভ্রম বলিয়া প্রথমে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মহেন্দ্র যখন তার পরদিন সকালে বিষয়টি উত্থাপন করিল, তখন, তাহারও মন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল।

আমি দরজা খুলিয়া দিয়া আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম। পরদিন বিকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া মহেন্দ্রের ভীতির কথা অবগত হইলাম। মহেন্দ্রের মনের অবস্থা ক্রমশঃই যখন শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন আমি আসল কথা চাপিয়া রাখা আর নিরাপদ মনে করিলাম না। কিন্তু মহেন্দ্র বেচারীকে সকলে গিয়া সে কথা

বলিলে, সে ভাল করিয়া যে বিশ্বাস করিল, তাহা বলা যায় না।

আমি সারাদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত দিনের কাজগুলি সমাপন করিয়া গেলাম। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আর আমার জীবনের সাধ পূর্ণ করিতে যাইব, সেই চিন্তাই কেবল আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যা সে দিন যেন কিছু বিলম্বে আসিল। আমি সেতার শিক্ষা করিতে চলিলাম। প্রথম দিন বলিয়া সেতারটি সঙ্গে লইলাম না, বিশেষতঃ যতির সম্মতি লওয়া হয় নাই।

গলির মোড়ে সাদা বাড়ী; বাহিরের ঘরেই বৈঠকখানা। সমস্ত মেঝেটায় ফরাস করা। জানালা দিয়া দেখিলাম, ঘরের কোণে কতকগুলি যন্ত্র—সেতার, তানপুরা, এস্রার, বাঁয়া-তবলা রক্ষিত আছে। ফরাসের উপর এক স্থানে একব্যক্তি বসিয়া পাখোয়াজের পিছনে তুম্ তুম্ করিয়া আঘাত করিতেছে। সম্মুখে একখানা কলাই করা ডিশে একতাল ময়দা রহিয়াছে, তাহা হইতে ময়দা লইয়া সে ব্যক্তি পাখোয়াজের বাঁয়ায় লাগাইতেছে। অনতিদূরে আর একব্যক্তি তানপুরার 'জোয়ারে' লাগাইতেছে। তানপুরা সম্মুখে রাখিয়া, বামহস্তে সোয়ারির নিম্নে তারের মধ্যে

সুতা দিয়া একবার উপরে উঠাইতেছে, একবার নীচে নামাইতেছে, আর তার ঝঙ্কার দিয়া 'জোয়ারে' সুর বাহির করিতেছে। অপর একজন সেই তানপুরার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুর ভাঁজিতেছে; তানপুরার সুরবাঁধা পর্য্যন্ত বিলম্ব তাহার সহিতেছে না।

আমি দেখিলাম, সে এক বিপুল আড্ডা। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতেই এই, এর পর না জানি আরও কত রকম বিরকমের লোক আসিয়া জুটিবে! আমি আর ঘরে ঢুকিলাম না। মন্ত্র চালিতের মত সে স্থান ত্যাগ করিয়া গোলদীঘিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি নির্জ্জন স্থানে ঘাসের উপরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সম্মুখে মৃদু বাতাসে গোলদীঘির বক্ষ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, আর চতুর্দ্দিকের আলোক মালার প্রতিবিম্ব যেন শত শত হীরকখণ্ডে ভাঙ্গিয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলাম। বুঝিলাম বীণাপাণি তাঁহার বীণাটি আমার হস্তে তুলিয়া দিয়া আমার মস্তক হইতে ফাঁকি দিয়া পুস্তকের বোঝাটি নামাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন! বস্তুতঃ সে আড্ডায় একবার গেলে

বি এ পাস করা ত দূরের কথা, মাথাটিও হয়ত চর্ব্বিত হইত। সে বিষয়ে যখন আর সন্দেহ রহিল না, তখন সংকল্প স্থির করিয়া, উঠিলাম। সেতার শিক্ষার কল্পনা গোলদীঘির জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলাম।

রাত্রি তখন ৯ টা। মেসে ফিরিয়া প্রথমেই হেম যতির ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহাদিগকে সমস্ত বলিয়া মনটা যখন একটু পাতলা হইল, তখন আমি আমার নিজের ঘরে গেলাম।

সকালে উঠিয়া দেখি, যতি বাহিরে গিয়াছে। হেম পড়িতেছে। আর, ঘরের মেঝেয় সেই সেতারটি শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে।

সেতারটির জন্য বড় দুঃখ হইল। যদিও সেতারটি ছোট ছিল, কিন্তু অতটুকু সেতারে অমন মিষ্ট সুর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পাছে ঐ সেতারের জন্য আবার আমি প্রলোভনে পড়ি, এই জন্যই যে যতি আমার জীবন পথ হইতে সেতারটিকে দূর করিয়া দিয়াছিল, তাহা আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। সেতারই যদি গেল, তবে আর শিখিব কি? আমার আর সেতার শেখা হইল না।

মহেন্দ্রের মন হইতে ভূতের ভয়ও গেল না।

পূজার ছুটি

(এক অঙ্কে সমাপ্ত নাটক)

স্থান :—দ্বিতল কক্ষ। কোচে স্বামী, চেয়ারে স্ত্রী, গড়গড়ায় ধূমোদ্গারী কলিকা, বারান্দায় কাকাতুয়া, টবে গাছ।

সময় :—আশ্বিনের শুক্লপক্ষে, আকাশের নিতান্ত নিরালা কক্ষে সূক্ষ্ম চন্দ্রলেখা। পূজার ছুটির পূর্ব্ব সন্ধ্যা।

স্ত্রী। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটা অসুখ না করে, আর ছাড়বে না! এই আপিস থেকে এসেই আবার বেরিয়েছিলে।

স্বামী। না, ঘুরতে যাই নি ত! সঙ্গীত সমাজে গেছলুম। সেখানে আজ 'রিজিয়া' হ'ল কি না; তাই বাবুরা আমাকে ভারি চেপে ধরেছিলেন যাবার জন্তে।

স্ত্রী। এই রকম ক'রে লোক না জোটালে বুঝি তাঁদের প্লেতে লোক হয় না?

স্বামী। তা হ'বে কেন? তাঁরা যে খুব ভাল প্লে করেন, এমনটি পেশাদারী থিয়েটারেও হয় না।

স্ত্রী। তা আমাদের ত আর দেখাবে না—ভালই হোক আর যা'ই হোক্!

স্বামী। তা না হয় তোমাকে পূজার সময় এক দিন অলিভ্ থিয়েটার দেখিয়ে নিয়ে আস্‌ব।

স্ত্রী। আমার থিয়েটারে গিয়ে কায নেই; পশাদারী থিয়েটার গুলো ভালও নয়, উপরন্ত রাত জাগতে হয়, লোকের ভিড়, গরম—সব বিশ্রী। আর আমি জানি, তুমিও ত ওসব পছন্দ কর না!

স্বামী। তবে শীতকালে সার্কাস এলে, দেখে এস।

স্ত্রী। হঁ্যা তত দিন যদি বাঁচি! সে বন্দোবস্ত এত আগে থেকে করবার কিছু দরকার নেই।

স্বামী। তবে আর কি করা যায়, তাই ভাবচি—

স্ত্রী। (অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া) কেন, ছুটিতে বেড়াতে গেলে হয় না?

স্বামী। না, সে কি কম হাঙ্গাম। তোমাদের সকলকে এই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া—সে হ'তেই পারে না।

স্ত্রী। তবে থাক্‌গে যাক্‌।—কায নেই। আচ্ছা এত ভিড় হচ্ছে কেন গা?

স্বামী। এই পূজার ছুটিতে অনেক লোক হাওয়া খেতে যাবে কি না! হাওয়া খেতে ঠিক নয়, হাওয়া পরিবর্ত্তন কর্‌তে—অসুখের জন্যে।

স্ত্রী। আমিও সেই জন্যে ভাবছিলুম—তোমার শরীরটাও ত ভাল নেই, ভাল ঘুম হয় না, খাওয়া কমে গেছে, দিন দিন কাঁচা হলুদের মত রঙ—কালি মেড়ে দিচ্ছে—

স্বামী। তার আর উপায় কি বল? কোথায় বা যাওয়া যায়?

স্ত্রী। (ভাল হইয়া বসিয়া) যদি যাও, তবে আগ্রায় চল। তাজ দেখে আসা যাবে।

স্বামী। সে যে অনেক দূ—র। তাজের দেখবে কি? একটা আগাগোড়া মার্ব্বেলের মস্‌জিদ্‌!

স্ত্রী। বল কি? এই সেবার তাজমহল দেখে এসে, তুমি এত সুখ্যাতি কর্‌লে। তোমার সে কবিতায়ও ত তার সুখ্যাতি ধরে না। দেখ্‌বে সে কবিতায় কি লিখেছিলে? সেই জন্যই ত আমার অত আগ্রহ।

স্বামী। (জিভ কাটিয়া) ওঃ, সেই কবিতা? (হাস্য)

তোমার সে কবিতাটা খুব ভাল লেগেছিল। (হাস্য) হ্যাঁ, হয়েছিল মন্দ না! সকলেই খুব প্রশংসা করেছিলেন, ছাপাতেও বলেছিলেন তা আমি ছাপাই নি! (হাস্য)

স্ত্রী। ঐ ত তোমার দোষ! ছাপালে একটা নাম থাকৃত। আর অমন সুন্দর কবিতা! কবিতাটা পড়্‌লে তাজ না দেখে থাকা যায় না!

স্বামী। তা ঠিক! কিন্তু সে সবার জন্য নয়। কবিরা এক রকম চোখে দেখেন, অন্যে কি তাই দেখ্‌তে পারে? এই মনে কর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—

স্ত্রী। কবির স্ত্রী হ'লেও পারে না? মনে কর সাক্ষাৎ স্ত্রী—কবির স্ত্রীলিঙ্গ কি গা?

স্বামী। কবির আবার স্ত্রীলিঙ্গ কি?

স্ত্রী। যেমন বাঘের স্ত্রীলিঙ্গ বাঘিনী, চাকরের স্ত্রীলিঙ্গ চাকরাণী, সেই রকম একটা অবশ্য আছে—

স্বামী। সে যাক্, এবারে আগ্রায় যাওয়া হতেই পারে না। এই ছুটিতে একটু বিশ্রাম করলেই আমার শরীর ভাল হয়ে যাবে। তোমাদের নিয়ে এখানে সেখানে ছুটো-ছুটি করলে অসুখ বেশী হবে বই কম্‌বে না।

স্ত্রী। তবে গিয়ে কায নেই—তবে গিয়ে কায নেই।

আমি মনে করলুম অসুখ ভাল হয়ে যাবে। বল্লে কি না—সবাই অসুখ ভাল হ'তে যাচ্ছে!

স্বামী। তারা যাচ্ছে অবিশ্যি—সে কি জান—সেটা ঠিক—মানে যে জন্যে যাওয়া—অর্থাৎ—

স্ত্রী। যাক্ ও কথা থাক্। আমার জেঠাইমা পূজার সময় এখানে আস্‌ছেন—বেশ থাকা যাবে—

স্বামী। (উঠিয়া বসিয়া) সে কি? বাড়ীতে যায়গা হবে কোথায়? তাঁর যে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে—মেয়ের ছেলে, এ সব—

স্ত্রী। সে সব রেখে তাঁকে একলা আস্‌তে হবে না কি?

স্বামী। তাঁদের আসা কি ঠিক হয়ে গিয়েছে?

স্ত্রী। চিঠি, নিয়ে আস্‌ব—দেখবে?

স্বামী। যাক্—দেখ, একটা কথা ভাবছি—দিন কতক কোথাও গেলে হয় না?

স্ত্রী। সে কায নেই—আবার সে টানাটানিতে অসুখ বেশী হ'বার সম্ভাবনা। ছিষ্টি সংসার অমন ক'রে ফেলে যাওয়া সে হতেই পারে না।

(অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় নলটি হস্তে লইয়া)

স্বামী। এই যে একটু আগে বলছিলে আগ্রায় যাবার কথা। তাই না হয় স্থির করা যাক্।

স্ত্রী। না, সে তোমার আবার অসুখ হ'বে। সে সবে আমি নেই!

(কাকাতুয়া চীৎকার করিল)

যাই—কাকাতুয়াটা ডেকে মরছে।

স্বামী। (আগ্রহের সহিত গাত্রোত্থান) শোনো, আমার অসুখ ত সে রকম কিছুই নয়। সে জন্যে তুমি ভেবো না।

স্ত্রী। শুধু তাই নয়, জেঠাইমা এলে তিনি ভারি দুঃখিত হবেন।

স্বামী। সে জন্য তুমি ভেবো না। সে আমি এখনই লিখে দিচ্ছি যে আমরা আগ্রায় বেড়াতে যাচ্চি।

স্ত্রী। না—আগ্রায় যাবার দরকার নেই। তার চেয়ে হরিদ্বার কি দিল্লী যাওয়া ভাল। আগ্রায় এক তাজমহল বইত নয়, সেও না কি দেখবার মত কিছু নয়!

স্বামী। দেখ্‌বার মত কিছু নয় কে বল্লে? কবির চোখে বেশী ভাল লাগে, তাই বল্লুম্।

স্ত্রী। তা, একটা কবি আঁচলে বাধা থাকলেও কি সে ফল হয় না?

স্বামী। তা সে যাই হোক্। বড় ভিড় হবে তাই ভাবছি। আগে হ'লে রিজার্ভ করা যেত। এখন সে চেষ্টা করা বৃথা।

স্ত্রী। (হাসিয়া) গাড়ী রিজার্ভ করা আমার সারা। সে কি চাঁদ, আর তোমার জন্তে বাকি রেখেছি?

(কাকাতুয়া হাসিয়া উঠিল)

যবনিকা।

সমাপ্ত